তিস্তা উপত্যকা, সিকিম - আলোকচিত্রী অর্ণব ঘোষ

বেড়ানোর কথা
আর ছবি নিয়ে
বাংলা
ই-ম্যাগাজিন

~ ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা - বৈশাখ ১৪২৫ ~

সকালবেলায় বড় বড় গাছে ছাওয়া জঙ্গলের সরু পথ ধরে হেঁটে আসা। বনপথের খানিক আগে আরেকটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে সাস্তাল গ্রামের দিকে। মাটির বাড়ির নিকোনো দেওয়ালে হাতে আঁকা রঙিন ফুল, নকশা। সাইকেলের টায়ার গড়িয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে আপন আমোদে হাসে বালক। মেয়ে বউদের জটলা। এসব পেরিয়ে গ্রামীণ আদিবাসী ঠাকুরের মন্দির অথবা থান। আবার এর উল্টোদিকে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে বিকেলবেলায় কমলা রঙের সূর্য বড়ন্তি বাঁধের জলে মুখ দেখতে দেখতে কখন যেন টুপ করে ডুব দেয় পাহাড়ের আড়ালে। আর অমনি মনখারাপের কুয়াশা মেখে শীত সন্ধ্যা নামে রাতের আঁধারে হারিয়ে যাবে বলে...

এরই ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে যায় অনাবশ্যক ছোট বড় হোটেল-রিসর্ট আর আসি যাই অকিঞ্চিৎকর আমরা।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় -

"সমাধির ওপর ঠান্ডা হাওয়ায় জাতীয় পতাকা ওড়ে। ওই যে ছেলেটি মূর্তির মত স্থির হয়ে 'অপারেশন বিজয়' লেখা স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে আছে অথবা ওই যে জওয়ানেরা ব্যস্ত কথায়-কাজে তারাও সবাই জানে এভাবেই একদিন হয়তবা জাতীয় পতাকা উড়বে তাদের সমাধির ওপরেও।"

- ধারাবাহিক ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র - লাদাখ পর্ব-এর শেষ পত্র দময়ন্তী দাশগুপ্তের কলমে

"ওমনি ছবির মতো প্রেক্ষাপট থেকে দুলে উঠে জ্যান্ত হয় শিবালিক। সুবিশাল ক্যানভাসে নিজ নিজ জায়গা ভরিয়ে আমরাও অংশ হয়ে যাই এ জাদু সফরের।"

শুরু হল - কাঞ্চন সেনগুপ্তের হিমাচল ভ্রমণকাহিনি "ঘোড়া অ্যাডজাস্ট কর লিজিয়ে"

~ আরশিনগর ~

সাদা পাহাড়ের দেশের নীল নদী
- মার্জিয়া লিপি

ধান্যকুড়িয়ার সন্ধানে - অভিজিৎ চ্যাটার্জী

~ সব পেয়েছির দেশ ~

পায়ে পায়ে ডাবলাহাগাং - অর্ণব ঘোষ

রাঁচিগমনঃ - তপন পাল

মিজোরামে নতুন বছর – সুবীর কুমার রায়

~ ভুবনডাঙা ~

ম্যান্ডেলার দেশ সাউথ আফ্রিকায় – শ্রাবণী ব্যানার্জি

~ শেষ পাতা ~

সিকিয়াঝোড়ার অন্দরে – তরুণ প্রামানিক

পাটনিটপ – পন্ড অফ দ্য প্রিন্সেস – স্বাতী চক্রবর্তী

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - 18 **AmaderChhuti.com ● Web Design: Madhuwanti Basu**

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনি - ষষ্ঠ পর্ব

আগের পর্ব – পঞ্চম পত্র

ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র - লাদাখ পর্ব

দময়ন্তী দাশগুপ্ত

~ *লাদাখের আরও ছবি* ~

শেষ পত্র

বন্ধুবর,

এবারের বেড়ানোর একেবারে শেষপর্বে চলে এসেছি। বেশ কিছুদিন বাইরে কাটিয়ে বাড়ি ফিরতে তো একরকম আরাম লাগেই। কিন্তু এত বড় একটা বেড়ানোর শেষে মনখারাপটাও যেন নিত্য সঙ্গী হয়ে যায়। আর কখনও আসা হবে কিনা জানা নেই।

কার্গিল থেকে শ্রীনগর দুশো কিলোমিটার। বছরকয়েক আগে সব খবরের কাগজেরই শিরোনামে থাকত কার্গিল। তখন এক তুমুল অস্থির পরিস্থিতি এখানে – গুলি গোলার শব্দ। এখন সব শান্ত। কাল সন্ধ্যেয় যখন পৌঁছলাম আলো-আঁধারিতেও বেশ বোঝা যাচ্ছিল বেশ জমজমাট একটা শহর। লেহ্ থেকে বেরোনোর পর এটাই একটা বড় শহরে এসে পৌঁছালাম। ব্যবসা বাণিজ্যেরও বড় জায়গা। তবে এখন দিনের বেলায় মনে হল শহরটা খানিক নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে - কারণ শীত এসে যাচ্ছে। আর কিছুদিন বাদেই লেহ্-কার্গিল-শ্রীনগর রোড বরফে ঢেকে যাবে - বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে লাদাখের সঙ্গে বাকী ভারতের সড়কপথে যোগাযোগ। লাদাখের ট্যুরিস্ট সিজন শেষ। হোটেলগুলো সবই খালি। আমাদের হোটেলেও আমরাই শুধু বাসিন্দা।

কার্গিল থেকে যাওয়া যেতে পারত আর্যগ্রাম - দা, হানু দেখতে। বলা হয় ওখানকার লোকজনের মধ্যেই এখনও খাঁটি আর্য রক্ত রয়েছে! আগের পত্রে খালাৎসে বলে একটা জায়গার কথা লিখেছিলাম না, সেখান থেকে দা, হানুতে রাত কাটিয়ে কার্গিল আসা যেত। আমরা তা না করে সরাসরিই চলে এসেছি হাতে সময় কম থাকায়। দেখা হল না জাঁসকর উপত্যকাও। তাতে আরও দু-তিনদিন লাগত অন্ততঃ। কার্গিল থেকে পারাচিক পাদুম হয়ে জাঁসকর নদীর পাশ দিয়ে জাঁসকর উপত্যকায়। শুনেছি অপরূপ সুন্দর নাকি সেই ভ্যালি। আর কিছুদিন পরেই শীতে যখন জাঁসকর নদী পুরো জমে যাবে তখন অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীরা আসবে প্রবল শীতে সেই বরফ জমাট নদীর উপর দিয়ে 'চাদর ট্রেক' করতে। অবশ্য ওখানকার লোকজনের কাছে ওটাই তখন স্বাভাবিক যাতায়াতের পথ। বিখ্যাত ট্রেকার রতনদা – রতনলাল বিশ্বাস একাধিকবার এই চাদর ট্রেক করেছেন। কলকাতার নন্দন প্রেক্ষাগৃহে দেখেছিলাম সেই যাত্রার স্লাইড শো। জাঁসকর না গিয়ে কার্গিল ছেড়ে আসার সময় মনে পড়ছিল সেই মাইনাস দশ থেকে ত্রিশ ডিগ্রি তাপমাত্রায় দিনের পর দিন হাঁটার, একটা গোটা জলপ্রপাত যেন জাদুমন্ত্রে হঠাৎ থমকে স্তব্ধ হয়ে থাকার ভয়ঙ্কর সুন্দর ছবিগুলোর কথা।

কার্গিল থেকে রওয়ানা দেওয়া হল সকাল নটা নাগাদ। সকালবেলায় রোদ্দুর বেশ ঝলমল করছে। সঙ্গী পথের পাশে নীলরঙা সুরু নদী। নদীর পাড় ঘেঁষে রঙিন গাছপালার সারি আর মাথার ওপরে ন্যাড়া পাহাড়। পৌঁছালাম কার্গিল ওয়ার মেমোরিয়ালে। আশপাশটা ফাঁকা ফাঁকা, পিছনে পাহাড় দিয়ে ঘেরা, দূরে ছড়ানোছিটানো রঙিন রঙিন বাড়ি। কয়েকজন বাচ্চা ছেলে-মেয়ে পাহাড়ি পথ বেয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে।

২২/১০/২০১৫

সকাল ১০ টা, কার্গিল ওয়ার মেমোরিয়াল

সামনে বড় সবুজ চত্বর পেরিয়ে ডানহাতে মিউজিয়াম। সামনেই রাখা আছে দুটো হাউটজার কামান, একটা মিগ প্লেন। মিউজিয়ামের মধ্যে কার্গিল যুদ্ধের স্ট্রাটেজিক পয়েন্টগুলো থ্রি-ডি মডেলের মাধ্যমে দেখানো আছে। রয়েছে বিপক্ষের সৈন্যদের থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র। জঙ্গিদের পরিচয়পত্র। সবুজ মাঠের মাঝে রয়েছে বিজয়স্তম্ভ। ঘন নীল আকাশের প্রেক্ষাপটে পতপত করে উড়ছে ভারতের জাতীয় পতাকা। একজন সেনা দেখাচ্ছিলেন পিছনের পাহাড়গুলির কোনটা টাইগার হিল, কোনটা টলোলিং - ওখানেই যুদ্ধ হয়েছিল। কয়েক বছর আগেই এই নামগুলো খবরের কাগজ-টিভির সৌজন্যে লোকের মুখে মুখে ঘুরত - ট্রামে-বাসে-ট্রেনে, চায়ের আড্ডায়। পাহাড়গুলো একদম চোখের সামনে ওয়ার মেমোরিয়ালের ব্যাকগ্রাউন্ডে। চত্বরের পেছনের দিকে সারসার সমাধি।

সেলুলার জেল দেখে যে অনুভূতি হয়েছিল, খানিক যেন তেমনই মনে হল। ভারতবর্ষের কোথায় কোথায় এদের বাড়ি ছিল, মা ভাই বোন বন্ধুরা ছিল, প্রিয়তমা ছিল, আর কতদূরে পাহাড়ের কোলে ঘুমিয়ে রইল। পেটের দায়ে চাকরি করতে আসা, মাথার মধ্যে চারিয়ে যাওয়া দেশাত্মবোধ...। অথচ যার জন্য এই লড়াই সেই দেশ আসলে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে মাপা যায় কি? যারা এই লড়াই জিইয়ে রাখে সেই নেতা-মন্ত্রীদের গায়ে কি একটাও আঁচড় পড়ে? এখনও ২০০০০ হাজার ফুট উঁচুতে বিশ্বের সব্বোর্চ সামরিক ঘাঁটি সিয়াচেন গ্লেসিয়ারে দুই পক্ষের সেনানী পরস্পরের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে নিয়ত পাহারায়।

সমাধির ওপর ঠান্ডা হাওয়ায় জাতীয় পতাকা ওড়ে। ওই যে ছেলেটি মূর্তির মত স্থির হয়ে 'অপারেশন বিজয়' লেখা স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে আছে অথবা ওই যে জওয়ানেরা ব্যস্ত কথায়-কাজে তারাও সবাই জানে এভাবেই একদিন হয়তবা জাতীয় পতাকা উড়বে তাদের সমাধির ওপরেও। মনে পড়ে গেল -

"When you go home tell them of us and say for your tomorrow we gave our today."

দুপুর সাড়ে বারোটা, দ্রাস

দ্রাস গ্রামে পৌঁছালাম। ভারতের শীতলতম জায়গা যেখানে মানুষের বসতি আছে। গড়ে মোটামুটি মাইনাস কুড়ি-পঁচিশ ডিগ্রিতে নেমে যায়। পথের দুপাশে রঙিন রঙিন বাড়িঘর-দোকান। ফলসবজির পসরা নিয়ে বাজার বসেছে। মাত্র বারোশো লোকের বাস, যার বড় অংশই মুসলিম। ভাবি অক্টোবরের মাঝামাঝি হয়ে গেছে, আর কিছুদিন পরেই বরফে ঢেকে যাবে চারদিক। সব জায়গাতেই দেখে এসেছি লোকজনে কাঠকুটো জমাচ্ছে, আসন্ন শীতের দিনগুলোর জন্য।

যুদ্ধের সময় কার্গিলের মত দ্রাস নামটাও পরিচিত হয়ে উঠেছিল বারবার খবরের কাগজে বেরোনোর সুবাদে। আমাদের গাড়ির ড্রাইভার ছেলেটির বাড়ি আদতে দ্রাস-এই। ও-ই বলছিল যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনি গ্রাম ফাঁকা করে স্থানীয় লোকজনকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এখন সবাই বেশ নিশ্চিন্ত। সামনে একটা মসজিদ। খানিকটা নীচে নেমে গেট পেরিয়ে বড় চত্বর। সেখানে ঢুকলাম। বাচ্চারা খেলা করছে চত্বরে। ইমাম সাহেব আমাদের মুঠোভর্তি লজেন্স দিলেন প্রসাদ হিসেবে।

সকালে তাড়াহুড়োতে কার্গিল থেকে জলখাবার খেয়ে আসা হয়নি। দ্রাস থেকে কেক, কলা, সামোসা, মিষ্টি কিনে গাড়িতে খেতে খেতে যাচ্ছি। এতক্ষণ রঙিন রঙিন বাড়িঘর চোখে পড়ছিল। এখন সব উধাও। সামনে উইন্ডস্ক্রিনজোড়া বরফের পাহাড়। বাকিটাও বেরঙিন। রাস্তা বেশ খারাপ - পাথুরে আর কাঁচা, ধুলো উড়ছে। বাঁহাতে পাহাড়ের নীচটা জলাভূমির মতো। মার্শল্যান্ড।

পৌনে বারোটা, জোজিলা ওয়ার মেমোরিয়াল

বরফের পাহাড়ে উঠে এসেছি আবার। গুমরি পেরোলো। তাড়া থাকায় জোজিলা ওয়ার মেমোরিয়ালে বেশিক্ষণ থাকিনি। ১৯৪৭-৪৮ সালে

পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে যেসমস্ত ভারতীয় সেনারা প্রাণ দিয়েছিলেন, তাঁদের স্মৃতিতে গুমরিতে এই ওয়ার মেমোরিয়ালটি তৈরি করা হয়।

পৌনে একটা, জোজি লা এবার সেই ভূগোল বইয়ে পড়া জোজি লা পৌঁছালাম। ছোটবেলার পাঠ্যবইয়ে পড়া সেই গিরিপথ। যুগে যুগে এই গিরিপথ পেরিয়েই ভারতে এসেছিল যাযাবর গোষ্ঠীর নানান দল - মোগল, পাঠান, হুন, শক, আর্য। একে একে সবাই লীন হয়ে গেছে সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং এই ভারতবর্ষে। জোজি লা এই পথের সবচেয়ে নীচু পাস। কিন্তু বরফ বরফ শুধুই বরফ। বরফে চারপাশ একেবারে সাদা হয়ে আছে। রাস্তায় সার সার গাড়ির লম্বা লাইন। জোজিলায় বরফের খবর পেয়ে দলে দলে লোকজন যারা কাশ্মীর বেড়াতে এসেছে, শ্রীনগর থেকে চলে এসেছে গাড়ি নিয়ে। সবাই হইচই করে বরফ নিয়ে খেলছে। আমরাও কিছুক্ষণ বরফ নিয়ে মজা করলাম সকলে মিলে। ভাবতেই অবাক লাগছিল যে এর আগে আঠারো হাজার ফিট ওপরে চ্যাং লা, খারদুং লা পেরিয়েছি, তখনও এত বরফ পাইনি আর এদিকে জোজি লা মাত্র এগার হাজার পাঁচশ ফিট, অথচ এরকম বরফে ঢাকা!

স্নোম্যান বানানোর খেয়াল চেপেছিল মাথায়। সেই স্নোম্যান যে জীবন্ত হয়ে উঠবে যেন গল্পের মত। কিন্তু চেহারাটা হল গিয়ে খানিক বুদ্ধের আদলের। নিজের বানানো স্নো বুদ্ধকে ফেলে আসতে একটুও ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু যেতে যেতেই তো গলে যাবে। তার চেয়ে একটা বরফের স্তূপ দেখে বুদ্ধকে বসিয়ে রেখে এলাম একটু মনখারাপ করেই।

জোজি লা থেকে বেরোনো হল। আমাদের ড্রাইভার বলল যে, আসল জোজি লা কিন্তু এটা নয়। খানিকটা এগিয়ে একটা জায়গায় দেখাল এটাই হল আসল পাস, দুটো পাহাড়ের মাঝের সরু রাস্তাটা।

পথে এখন অনেক গাড়ি - বড় বড় লরি, মিলিটারি ট্রাক, টাটা সুমো, কোয়ালিস। মাঝেমাঝেই রাস্তা বেশ খারাপ, সারানোর কাজ চলছে অবিরত। মাঝে মাঝেই বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়াতে হচ্ছে সেইজন্য। এখনও চারদিকে রুক্ষ পাহাড়, কিন্তু লাদাখের সেই নির্জনতাটা যেন কমে আসছে ক্রমশঃ। এরপরেই গাড়ি একটা মোড় নিল আর হঠাৎ করে পাহাড়গুলো বদলে গেল - বড় বড় সবুজ গাছ - চেনা হিমালয়ের আদল। আসলে লাদাখ হিমালয়ের বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে পড়ে, ফলে ওদিকটা অমন রুক্ষ। পাহাড়ের একই উচ্চতায় এই জায়গাটায় কিন্তু সবুজ গাছ।

হঠাৎই ভূপ্রকৃতিটা বদলে গেল। বরফ, কিন্তু পাইন, চিনারের সারি পাহাড়ের গায়ে। আমরা লাদাখ থেকে বেরিয়ে এসেছি। এবারে কাশ্মীর - যেখানে লোকে সাধারণত যায়, ঢুকে পড়েছি ভূস্বর্গের সেই জায়গাটায়। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে যাবে সোনমার্গ। সেখান থেকে শ্রীনগর - কাশ্মীরের পরিচিত বেড়ানোর রুট। আমাদের এবারের বেড়ানোর পরিকল্পনায় সেই চেনা কাশ্মীর নেই। একটা দিন শ্রীনগর-ডাল লেক-গুলমার্গে বুড়িছোঁওয়া করে উড়ে যাব দিল্লি - সেখান থেকে ফিরে যাওয়া সেই চেনা বাড়ি চেনা মাঠ চেনা নাগরিক জঙ্গলে।

এখন আশপাশের গাছপালা সব সবুজ হয়ে গেছে। লাদাখের সেই অদ্ভুত রুক্ষ নির্জনতা, সেই সব হলুদ, বাদামী, তামাটে পাহাড় এখন অতীত। জানিনা আর কখনও ফিরে আসব কি না।

গাড়ির জানলা দিয়ে অমরনাথ যাত্রাপথের বালতাল ট্রানজিট ক্যাম্প দেখা যাচ্ছে নীচে।

(শেষ)

~ *লাদাখের আরও ছবি* ~

লেখালেখি, বেড়ানো, নানা রকম বই পড়া, ন্যাশনাল লাইব্রেরি আর কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ায় যাওয়া, কখনোবা গলা ছেড়ে গান গাওয়া এইসবই ভালো লাগে 'আমাদের ছুটি'-র সম্পাদক দময়ন্তী দাশগুপ্তের।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly , please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory .

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-18 - AmaderChhuti.com • W eb Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনি (২) - প্রথম পর্ব

থোড়া অ্যাডজাস্ট কর্ লিজিয়ে

কাঞ্চন সেনগুপ্ত

হিমাচলের তথ্য ~ *হিমাচলের আরও ছবি*

জানি না সদর্থে এটা কোনও ভ্রমণ কাহিনি হয়ে উঠবে কিনা। কোনোরকম 'কাহিনি' গড়ে তোলার দায়ও স্বীকার করছি না এ লেখার কোনও ছত্রেই। শুধু যা দেখে এলাম, যেভাবে দেখে এলাম তা জানাবার তাগিদ থেকেই লিপিবদ্ধ করতে বসেছি এবারের 'বেড়াতে যাওয়া', বন্ধুরা মিলে চিরন্তন সিমলা-কুলু-মানালি-রোহ্তাং-সোলাং-নগ্গর ইত্যাদি ইত্যাদি। সময়কালটা বলি, কারণ এটা ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে দাঁড়াবে। মে মাসের ১৯ তারিখ কোলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করে ২৯শে মে ফিরে আসা কোলকাতায়। একে তো কোল্ড-ফেভারিট টুরিস্টস্পট তার ওপর পিক্ সিজন্; যদি কোনও পাঠক ভেবে থাকেন বরফ, শীত আর সিনারিমাখা রম্য ভ্রমণ কাহিনি উপভোগ করতে চলেছেন একখানা, তবে মার্জনা করবেন, এই লেখকের দেখার চোখ, লেখার হাত ও অভিজ্ঞতার চামড়া কোনোটিই তদনুরূপ সরেস হতে পারছে না। চাইলে আপনি এখানেই ক্ষান্ত দিতে পারেন। আবার চাইলে...

তারিখ অনুসারে নয়, এবারের বর্ণনা অবস্থান অনুসারী হোক।

প্রথম অবস্থানঃ IRCTC ওয়েবসাইট। কালকা মেলের টিকিট। সতেরোই জানুয়ারি ২০১৭ সকাল আটটা বেজে এক মিনিট কয়েক সেকেন্ড, অনলাইন টিকিট ভেসে উঠল চোখের সামনে WL 39, 40, 41, 42, 43, 44। আমি জানিনা কারা সেই সুপারম্যান যারা সোজা পথে রেলের কনফার্মড টিকিট পায়। নিশ্চয়ই পায় কেউ, কিন্তু আমার মতো অসহায়দের জন্য এখানেই একটা ট্যুরের মজা মাটি হয়ে যাওয়া অসঙ্গত কিছু নয়। আর এ চিত্র বছরের প্রায় সব সময়ই। প্রসঙ্গতঃ, আমি আজ থেকে সাত বছর আগে বৌকে নিয়ে এই একই ট্যুর করেছিলাম, এই কালকা মেলেই টিকিট কেটেছিলাম। সেবারও টিকিট পেয়েছিলাম RAC 1 ও 2 এবং বিশ্বাস করুন পাঠক, যাত্রাকালে আমরা ট্রেনেও উঠেছিলাম ওই RAC 1 ও 2 নিয়েই। সত্যি এর সমাধান জানিনা, কারণ আমি জানি না সমস্যাটা কোথায়? এত সিট্ কোথায় যায়? কোটা? কত সেটা? তাই প্রতিবারই আমার ভ্রমণকাব্য শুরু হয় একঘেয়ে এই ছন্দপতন দিয়ে। প্রতিবারই নাক-খত্ দিই, সিজন্-এ আর বেড়াতে যাচ্ছি না। এবারে তো বলেছি, আর বেড়াতেই যাব না। রেলগাড়ি ফিক্ করে হাসল!

দ্বিতীয় অবস্থানঃ ট্রেন। এবার শিবালিক। (দেখুন শিবালিকে যখন চড়তে পারছি কালকা থেকে, তখন নিশ্চয়ই আমার মতো অসহায়েরও কোনো কোটাধারীই সহায় হয়েছিলেন... এটা কি আর আলাদা করে বলে দিতে হবে?) কালকা ছেড়ে সিমলা যাওয়ার ভোরের শিবালিক মানে এক স্বপ্নময়তা। ট্রেন থেকে নেমে খানিক S-এর মতো বাঁক নিয়েই কালকা স্টেশনের সেইসব প্ল্যাটফর্মগুলোতে পৌঁছে যাওয়া যায়, যা আসলে এক জাদুনগরী পাড়ি দেওয়ার গুপ্তদ্বার, হঠাৎ করে সামনে এসে পড়ে। যাত্রীরা বিহ্বল হয়ে দেখে, "আরে কোথায় ছিল এমন একটা জগত যাকি না এতাবৎ হাওড়া টু কালকার ঠিক ওপিঠের থেকে এক্কেবারে আলাদা।" আলো-আঁধারির মধ্যে ধীর ব্যস্ততা জেগে ওঠে খেলনা-গাড়িটিকে কেন্দ্র করে। হুস্ হুস্ ইঞ্জিন, খটাখট লিংক-আপ, "ওরে রামা ছুটে আয়, নিয়ে আয় লণ্ঠন" ইত্যকার হুলুস্থুলুর মধ্যেই চমক লাগানো বাঁশি বাজে; ওমনি ছবির মতো প্রেক্ষাপট থেকে দুলে উঠে জ্যান্ত হয় শিবালিক। সুবিশাল ক্যানভাসে নিজ নিজ জায়গা ভরিয়ে আমরাও অংশ হয়ে যাই এ জাদু সফরের। সফর গড়িয়ে চলে পাহাড়ের কোলে কোলে, ছোট-বড় টানেল পেরিয়ে। যত ওপরে উঠতে থাকি, সূর্যও উঠতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে, কুয়াশা কুয়াশা ভাবটা সরতে থাকে। পাহাড়, পাহাড়ের ধাপ, ধাপে ধাপে পাইন, পাইনের পায় পায় জড়িয়ে জড়িয়ে নাΣউক্ বাঁক, বাঁকেরা লুকিয়ে রাখছে মায়াবী রেলপথ, আমরা... কুউউউ ঝিক্ ঝিক্... ঠিক খুঁজে নিচ্ছি যেই সেই চোরা চোরা পথ ওমনি সে-পথ কোনো এক সুড়ঙ্গে সুড়ুৎ সেঁধিয়ে গেল... অন্ধকার। এভাবে চলতে চলতে বাইরের কুয়াশা কাটে বটে, তবে আমরা জড়িয়ে যাই অনাবিল মায়ায়, জড়িয়েই থাকি। এভাবেই পেরিয়ে যাই সবচেয়ে দীর্ঘ টানেলটি। যার নাম ব্যারোগ টানেল (Barog), ক্যাপ্টেন ব্যারোগের নামে। টানেল পেরিয়েই গাড়ি দাঁড়াবে ব্যারোগ স্টেশনে। এখানে আমরা দাঁড়াব খানিকক্ষণ। ঠিক 'দাঁড়ায়' না কেউ এখানে, একমাত্র গাড়িটি ছাড়া। সবাই ছটফট করতে থাকে দারুণভাবে। বাচ্চা থেকে বুড়ো সব্বাই। চটপট গাড়ি থেকে নেমে পড়ে সবাই। ক্যামেরা, মোবাইল ইত্যাদি নিয়ে উদভ্রান্তের মতো ছবি তুলতে থাকে। আমি তো দাঁড়ানো ইঞ্জিনের চাকার ফাঁক দিয়ে অল্প অল্প সাদা ধোঁয়া বেরোচ্ছিল, তার ছবিও তোলার চেষ্টা করলাম মোবাইলে। আসলে এক ছবির মতো সফর থেকে আমরা এসে পড়লাম আরেক রূপকথার সিনারিতে। তাই এই দিশাহারা উৎফুল্লতা। ব্যারোগ স্টেশনটা যারা দেখেছেন তারা আমার সাথে একমত হবেন নির্ঘাত। এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াবো আমরা। রেল-কোম্পানি আমাদের নাস্তা খাওয়াবে। টিকিট রিজার্ভ করার সময়েই উল্লেখ করে দিতে হয় ভেজ / নন্‌ভেজ। আমরা সবাই ছিলাম নন্‌ভেজ, তবু ছ'টা প্লেটের পাঁচটা এল নন্‌ভেজ আর একটা ভেজ। পরিবেশক ছটফটে তরুণটি পোলাইট হেসে বলল, 'থোড়া অ্যাডজাস্ট কর লেঙ্গে?' আমরা তখন এমনিতেই বুঁদ হয়ে আছি প্রকৃতিতে। সত্যি, মানুষ আনন্দে থাকতে পারলে কতটা সহজ থাকতে পারে, আর সহজ থাকতে পারলে কতটা আনন্দে থাকে! যাক্‌গে, গাড়ি যখন খানিক দাঁড়াবেই তাহলে অল্প কিছু বলে নিই এই ফাঁকে।

কালকা থেকে সিমলা রেলপথে ছোট ছোট আরো বেশ কটি, প্রায় ১৫/১৬টি রেল স্টেশন আছে। গুম্মান, কোটি, সোনওয়ারা, সোলান, কাঠলীঘাট...

যেমন তাদের মনভোলানো সারল্য তেমন তাদের গ্রাম্য নামের বাহার! মনে হবে সব ক'টিতেই নেমে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে যাই। এই আস্তানাগুলি বানানো হয়েছিল এই লাইন পাতার সময়, সেই-ই ব্রিটিশ আমলে। লাইন পাতার মজদুরদের থাকার মেস্। পরে সেইগুলোকেই স্টেশনে রূপান্তরিত করা হয়। গোটা রেলপথে ছড়ানো মোট ১০৩টি টানেলের, লম্বায় সবচেয়ে বড় যেটি, মানে এই ব্যারোগ টানেল সম্পর্কে শোনা যায়, ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন ব্যারোগকে কোম্পানি ভার দেয় এই টানেলটির জন্য। ব্যারোগ সাহেব পাহাড়ের দু'দিক থেকে একসাথে টানেল খোঁড়ার কাজ শুরু করেন। উদ্দেশ্য তাড়াতাড়ি কাজ চালিয়ে পাহাড়ের মাঝামাঝি দুদিকের টানেল এক জায়গায় মিলিয়ে দেওয়া। তেমনটা হয় না। হিসেবের গন্ডগোলে শেষমেষ দেখা যায় দুইশপ্রান্ত এক জায়গায় মিশছে না। কাজের বরাত ব্যারোগ সাহেবের হাত থেকে চলে যায় এবং তাঁকে ১ টাকা জরিমানা করা হয়। এ অপমান সাহেব সহ্য করতে পারেন না। অসমাপ্ত টানেলের মধ্যে ঢুকে আত্মহত্যা করেন। পরবর্তীতে তাঁর নামেই টানেলের নামকরণ করা হয় সম্ভবতঃ তাঁর সিন্সিয়ারিটিকে সম্মান জানিয়ে।

এবার উঠে পড়ি ট্রেনে। শিবালিক ছাড়বে। এরপর কাঠলীঘাটে একবার থামবে। পাশের লাইনে সরে দাঁড়াবে। সিমলা থেকে আগত কালকাগামী ট্রেনটিকে এখানেই জায়গা দেবে শিবালিক। আগেরবারও এরকমই হয়েছিল। তারপর আবার সিঙ্গল লাইনটি ধরে সিমলা পৌঁছতে পৌঁছতে বাজবে বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা।

মায়াবী রেলপথে

তৃতীয় অবস্থানঃ বানিজ্যনগরী সিমলা। মহা মুস্কিল! সিমলা বানিজ্যনগরী হয়ে উঠবে তাতে আর আপত্তির কি আছে? আমাদের সঙ্গে বিরোধ বাঁধল এই যে, আমরা চেয়েছিলাম ওল্ড বাসস্ট্যান্ড থেকে যে রাস্তাটা এঁকে বেঁকে সোজা চলে গেছে সিমলা-ম্যাল-টুরিজম্-লিফটের দিকে, সেই রাস্তার ওপর কোনো থাকার জায়গা। আলিশান আরাম দরকার নেই, রাতটুকু ঠিক মতো কাটাতে পারলেই হবে। নেট ঘেটে ফেললাম। ঐ যে বলেছি সিজন্ টাইম। ওখানে গিয়ে যদি না-কিছু পাই! নেটে পেয়েও গেলাম। সরাসরি হোটেল মালিকের ফোন নাম্বার। হোটেল একেবারে রাস্তার নিচে (মানে ধারেই)। পঞ্চায়েত ভবন লাগোয়া। পরপর বেশ কয়েকবার ফোন কল ও ই-মেইল চালাচালি করে দর-ও নেমে এল হাজার দেড়েক টাকা পার-ডে। ট্যাক্সি নিয়ে সোজা হোটেল। তিনটে রুম। দেখে-টেখে নিজেরাই নিজেদের বললাম, এই খরচে, এই লোকেশনে, এর বেশি আর কিইবা আশা করা যায়! আর শুধু তো রাতটুকু... দিনেরবেলা তো আমরা টো টো কোম্পানি। তিনটে ঘরে ভাগাভাগি করে আমাদের মালপত্র রেখে সবাই বেরোব দুপুরের খাবার খেতে; নামল বৃষ্টি। ছাতা ছিল সঙ্গেই। হোটেলের লোকেশনটা যে জব্বর আগেই বলেছি। হাঁটাপথে ম্যাল বা বাসস্ট্যান্ড মিনিট দশেকের মামলা। আর খাবার-দাবারের দোকান তো রাস্তায় উঠে এলেই... ছিঁটেফোঁটা বৃষ্টি মাথায় নিয়ে খাবার হোটেলের ভেতরে ঢুকে খাবার অর্ডার দেওয়ার পর-পরই নামল ঝমঝম করে বৃষ্টি, সঙ্গে শিল। দেখতে দেখতে সাদা হয়ে গেল কালো পিচের রাস্তা। টিনের চালে অঝোরে শিল-তরঙ্গ। দোকানি কিশোর, একটা ছোট ফোকর গ'লে উঠে গেল চালে। মুঠোভর্তি শিল পাকিয়ে গোলা বানাচ্ছে ভিজে ভিজে। ওটা দিয়ে কিছু করে ওঠার আগেই আমরা লোভীর মতো চেয়ে বসলাম ঐ গোলা। খাবার দিতে দেরি হচ্ছে। লোডশেডিং। মোমবাতি সহায়। আমাদের সেসব খেয়াল নেই। ফিরে গেছি ছোটবালায়। আজ ২১শে মে ২০১৭। এবারও সিমলায় মরসুমের প্রথম বারিষ এল, আমরা যেদিন সিমলা এলাম।

ব্যারোগ স্টেশন

খাওয়া শেষ করে হোটেলে ফিরলাম। বৃষ্টি ধরে এসেছে ততক্ষণে। খানিক জিরোবো, না আড্ডা দেব, নাকি কালকের জন্য গাড়ি/বাস বুক করতে বেরোবো ভাবছি... মাথায় ছাদ ভেঙ্গে পড়ল। একটি ঘরের সিলিং থেকে চুঁইয়ে জল পড়ছে ঠিক বিছানার মাঝখানটায়। দৌড়োদৌড়ি লেগে গেল। যতটা ব্যস্ততা আমাদের মধ্যে দেখা গেল, ততটা কিন্তু হোটেলওয়ালার মধ্যে দেখা গেল না। সদা-হাসিমুখ ম্যানেজারবাবু, তার স্যাকারিন হাসিটা ঠোঁটে বিছিয়ে রেখে আমাদের কোঁচকানো ভুরুগুলোর দিকে চোখ রেখে বলে যেতে লাগল ক্রমাগত, "সরজি, ম্যায় বিশ শালসে হু ইঁহা। অ্যায়সা কভি নেহি হুয়া। ও সর্, পানি জানে কি নালী কে মুহ্ পে না, কেয়া হুয়া, ওলে (শিল) জম্ গয়ে অর নালী জাম হো গয়া, অর সরজি, ও পানি পাস্ নেহি হো পায়া অর ইধর আগয়ে।" আমাদের চোখ কপালে ওঠার

বানিজ্যনগরী সিমলা

জোগাড়। রাত-বিরেতে এরকম বৃষ্টি হলে? আবার চট্‌জলদি উত্তর, "অ্যায়সা নেহি-না হোতা হ্যায়। আপ ফিকর মত্ করো সর্‌জি, নালী সাফ কর দিয়া হ্যায়, অর পানি নেহি টপকেগা।" যে লোক হাসিমুখে এই আশ্বাস দিচ্ছে যে আর বৃষ্টি হবে না বা আর শিল পড়বে না বা পড়লেও আর রেন-ওয়াটার পাইপ জাম হবে না, তাকে আর কিভাবে কি বোঝাবেন বলুন তো! আমরা হতবম্ভ হয়ে হতাশ গলায় জানতে চাইলাম, আচ্ছা আমাদের ওপরেও তো ফ্লোর আছে! সেসব পেরিয়ে কিভাবে সিলিং থেকে জল লিক্ করছে? জানি এরও কোনো নির্বাক করে দেওয়ার মতো লাগসই উত্তর আসবে, এলও... "পানি আয়া তো! যা-কে দেখিয়ে, আপসে জাদা পানি আয়া উধর! ইস্ লিয়ে তো আপ লোগোঁ কো উও সব রুম নেহি দিয়া। সর্ জি পাঁচ মিনিট রুকো, আপকা বিস্তর্ চেঞ্জ কর দেতে হ্যায়।" আমরা শেষ একবার মরিয়া ট্রাই করলাম, "কিন্তু এই রুমে কি-করে থাকা যায়?" আবার আশ্বাস, "সর্‌জি, কাল আপকো দুসরা রুমমে শিফ্‌ট করওয়া দেঙ্গে,আজ থোড়া অ্যাডজাস্ট কর লিজিয়ে।"
ফলতঃ যেটা হল আমরা তিনজন মিলে বেরিয়ে পড়লাম বাস স্ট্যান্ডের দিকে, উদ্দেশ্য পরের দিন সিমলা ঘোরার জন্য যদি কোনো গাড়ি ঠিক করা যায়। আর তিনজন ফিমেল 'একটু জিরিয়ে নি' বলে একসাথে অন্য একটি ঘরে দলা পাকিয়ে শুয়ে রইল। কথা হল আমরা বাস স্ট্যান্ড থেকে ফিরে সবাই মিলে ম্যালে যাব।

চতুর্থ অবস্থানঃ সিমলা ম্যাল। সিমলায় ম্যালের থেকেও আমার কাছে আকর্ষক ম্যালে ওঠার লিফ্‌ট। দারুণ অবাক হয়েছিলাম আগেরবার। এবারেও উৎসাহ ছিল বেশ। হেঁটেই পৌঁছে গেলাম লিফ্‌টের গোড়ায়। ভিড় এখানেও। লাইন পড়েছে। শুরু হল বৃষ্টি। না না, এভাবে একেবারে কিছু না বলে চলে যাওয়াটা ঠিক নয়। সব্বাই সিমলা ঘুরে এসেছে এটা ভেবে নেওয়া ঠিক নয়। যাঁরা এখনো যাননি আপনাদের জন্য বলি, হাঁটতে না-চাইলে ট্যাক্সি করে নিতে পারেন। ওল্ড বাসস্ট্যান্ড থেকে সিমলা ম্যাল ট্যুরিজম্-লিফ্‌ট বললে একশো টাকায় নিয়ে যাবে। গিয়ে দেখবেন, ওমা! এতো হেঁটে আসলেই হত! লিফ্‌টে টিকিট কেটে উঠতে হয়। কত করে টিকিট জিজ্ঞেস করলে... বলব না। আপনি কবে যাবেন, তখন কত দাম থাকবে টিকিটের কে জানে? আরো কোনো জিএসটি বা আরো কিছু লেগে যাবে কিনা ততদিনে... বাদ দিন। লাইন দিয়ে যে লিফ্‌টে উঠলেন এটি প্রথম লিফ্‌ট। তুলে আনবে আপনাকে অর্ধেক পাহাড়। সেখান থেকে বেড়িয়ে খানিক পাকদন্ডী করিডর, যার মাথায় শেড দেওয়া! যেন কোনো রাজার মহলের চিলতে ঝুলবারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন আপনি। পড়ন্ত বিকেলের সূর্য সরাসরি ঝিলিক ফেলছিল চোখে; দুষ্টু কিশোর যেমন আয়নার টুকরোয় রোদ্দুর ধরে চোখে ফেলে। করিডোরের অপর প্রান্তে দ্বিতীয় লিফ্‌টের দোরে দাঁড়িয়ে সূর্যের দুষ্টুমি দেখছি; ওমা গো! ঐ সূর্য আর এই ঝুলবারান্দার ঝিল্লির মাঝের খাদে ঝম ঝম নেমে এল বৃষ্টি। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই করিডোরের চাল বেয়ে সারি সারি ধারাপাত; শেষ বিকেলের সোনা গায়ে গুলে নিয়ে অঝোরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নিচে। লিফ্‌টের দরজা খুলে গেল। আমরা উঠে এলাম আরো অর্ধেক পাহাড়।

সিমলা ম্যালের কাফে

সিমলা ম্যাল। চার্চ, মিউনিসিপ্যালটি ভবন, হাসপাতাল ইত্যাদি সম্বলিত প্রকৃতির রুফ-টপে এ যেন এক ওপেন-এয়ার শপিং মল। কতকটা ঠিকই বললাম। আমার মতো যারা ভীষণ ছিঁচকাদুনে টাইপের, তারা মুখ বেঁকিয়ে বলতে পারেন, এখানে মালিন্য নেই। একদম ঠিক। সবকিছু ঝকঝক করছে। ঐ যে অনেকটা ঘুরে আলসেমি করে বাঁক নিয়েছে চওড়া রাস্তা, ঐ যে রাস্তার পাশে ঠাসাঠাসি সব মণিহারি দোকানের সারি কি-মনোহরি, ঐ যে দোকানে দোকানে রাস্তায় আহ্লাদে আটখানা শিশু-বুড়ো-যুবক-যুবতী... বেপরোয়া বা সাবধানী, ঐ যে সব দিল্লি, হরিয়ানা, কেরল, কর্ণাটক, বাংলা... মানে তামাম ভারতবর্ষ কেমন লুটোপুটি, কেমন দিশেহারা, কেমন সবটা আলোয় আলোয় মাতোয়ারা, সবটা ঝকঝকে। এখানের ভিড় উদ্‌ভ্রান্ত, আত্মমগ্ন, টইটম্বুর। এখানের ভিড় ফুরফুরে, গায়ের ওপর এসে পড়ে না। এখানে আপনি একলা হতে পারেন অনায়াসে। দেখতে পারেন নিজের মনে, অস্তমিত সূর্য দূরের পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে জোনাকিদের (পাহাড়ি গ্রাম) তার আলো বিলিয়ে দিয়ে ডুবে যাচ্ছে। এখানের হইচইয়ের ওপর আলগা একটা নৈঃশব্দের কুয়াশা কুয়াশা জড়িয়ে থাকে। বৈভব আছে, আপনি না-চাইলে আপনাকে ধাঁধাবে না! মত্ততা আছে, আপনি মাতাল হবেন, নাকি বুঁদ হয়ে থাকবেন, পুরোপুরি আপনার সিদ্ধান্ত। আজ এখানে কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার সাথে যখন তখন ঝাপতাল বৃষ্টি আসছে। চার্চের পাশে যে ওয়াচ টাওয়ারের মতো উঁচু বসার জায়গাটা, তার পিছনটায়, সবার আড়ালে প্রায় একটা ছবির মতো নিরালা কুটীর - 'Book Café - The Takka Bench'। লাইব্রেরি ও চা-কফি-স্ন্যাক্স-এর এক লাজবাব মেলবন্ধন! সিমলা ম্যালের জগঝম্পতে সময় 'কাটে' না; সময় কেমন মিলিয়ে যায়...ফুস্‌স্‌স্! আর ম্যালের এক কোণায় নাম-না-জানা বনফুলের মতো এই আস্তানাটিতে সময় যেন চুপটি করে এসে পা-গুটিয়ে বসে পাশের চেয়ারটিতে। এর বেশি লিখলে মনে হবে বিজ্ঞাপন করছি, কিন্তু একটি মাত্র হাফ-তথ্য দিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাব, এই ক্যাফেটি সিমলা জেলের কয়েদিদের দ্বারা পরিচালিত।

পঞ্চম অবস্থানঃ সিমলা ঘুরে দেখার প্ল্যান। দেখে শুনে গাড়িই ঠিক করা। যারা 'সব' ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেয়। বুড়ির চুল (Candy floss) আস্বাদন করা আছে নিশ্চয়ই। বুড়ির চুলের ঠাট্টাটা কেমন? মুখে দেওয়ার আগে চোখের সামনে, কাঠির ডগায় যে গোলাপী প্রলোভন তার মায়া ফাঁপিয়ে আপনাকে ফুসলাচ্ছে, মুখে দিলেই, ওমা! চুপসিয়ে এতটুকু! আপনারা হয়তো অনেক জায়গা ঘুরেছেন, তার মধ্যে সিমলাও আছে নির্ঘাৎ, সাইট-সিইং-এর নামে সিমলায় যা হয়, তা ঐ বুড়ির চুলের ঠাট্টাটাই মনে পড়ায়। ল্যামিনেট করা A4 সাইজ পেপারে ছবিসহ যে লিস্টি থাকে 5 points / 7 points / 12 points-এর, তা দেখে আপনার মনে হতেই পারে অনেক সস্তায় অনেক ঘোরাচ্ছে। আগেরবার ওরকম 'সস্তায়' ঘুরে নিয়েছিলাম বলে, এবার আগের থেকেই দাঁতে দাঁত চেপে ছিলাম "শুধু ফাগু", ইচ্ছা করলে চেইল রাজবাড়ি (এখন তো ওটা র‍্যাঞ্চোদের বাড়ি)। গাড়িওয়ালার থেকে পেলাম নালদেহ্‌রা আর তত্তাপানি বা তপ্তপানি, অর্থাৎ আরো একটি গরম জলের ঠেক। জানা গেল ফাগু হয়ে ঐ দুটো জায়গায় ঘোরা যাবে না। সময় হবে না। ফাগুটাকে ছাড়তে চাইছিলাম না, ঐ যে পাহাড়ি রাস্তায় ঘোড়সওয়ারি। তাই শেষমেষ কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়েই পান্‌সি চলল কুফরি। এখানে বলে রাখি, গাড়িওয়ালা বড়মুখ করে বলবে কিন্তু "কুফরি ঘুমায়েঙ্গে, ফাগু ঘুমায়েঙ্গে"। আপনিও গুগল্ মামার থেকে কুফরি, ফাগুর আলাদা আলাদা ছবি দেখে মুগ্ধ! আহা আহা আহা... আবেগ সংযত করুন, না করতে পারলে চিটেড ফিল করবেন। কুফরি আর ফাগু, একদমই কিন্তু সিংহী পার্ক আর একডালিয়া সার্বজনীন। সরি, কলকাতার বাইরের মানুষদের জন্য বলি, মুকেশ অম্বানীর নতুন সাতাশতলা বাড়িটার একতলা যদি হয় কুফরি, তবে সাতাশতমতলটির ওপর উঠলেই হল গিয়ে যাকে বলছি ফাগু ভ্যালি।

ফাগু ভ্যালিঃ খুব জোরের সঙ্গে আমার মত, এই জায়গাটায় বরফের সময় ছাড়া যাওয়া উচিৎ নয়। এই সময় কোথাও এক চিলতে বরফ নেই। এই সময় এখানে না-আসাই শ্রেয়। আর যদি গতরাত্রে মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে কি-দাঁড়ায় আপনাদের দেখাই। কুফরি গাড়ি স্ট্যান্ডে গাড়ি পার্ক হয়ে গেল। এখান থেকেই কাটা হয়ে গেল ঘোড়ার স্লিপ। ৫০০ টাকা/ঘোড়া, সহিসসহ; দরদাম করে দেখতে পারেন। রুট একটাই। এই

সামনের যে পাহাড়ের ঢালটা দেখছেন ঘোড়ার খুরে খুরে খুঁড়ে খুঁড়ে গেছে, এই উপল-বন্ধুর পথ ধরে সারি সারি ঘোড়া, আর ঘোড়ার ওপর বসে থাকা নানানরকম নমুনা দেখতে দেখতে, আমাদের মতো আপনিও পৌঁছে যাবেন ঢালটার ওপরে। আর ঢালের ওপারেই ভ্যালি।

ফাগুর পথে - ঘোড়া খালি খাদের দিকে যায়

না, এখানে সব ঘোড়ার নাম রাজু নয়। আলাদা বাহারি নাম আছে সবার। তবে সব পাহাড়ের ঘোড়াদের মতো এদেরও একই স্বভাব, খাদের ধার ঘেঁষে যাওয়া। আরে আজ এইরকম কাদা-মাখা অবস্থা এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে ঢালটার... "ও ভাই, ও ঘোড়াওয়ালা, আরে ঘোড়া সামালো! হেইঃ কেইদিকে লে যাতা? খালি খাদকে ধারমে যাতা... হেই দেখো পিছলে পিছলে যাতা তো!" সহিসব্যাটাচ্ছেলেগুলোকেও দেখবেন ভারি চেনা লাগছে! ভালো করে দেখুন, এইরূপ ঘাড়-গুঁজে চলা উদাসীন বিশেষ প্রজাতির প্রাণীগুলোকে আমরা কলকাতায় মেট্রোতে দেখিনা নিয়ত? কানে ঠুলি (ইয়ার ফোন) গোঁজা, কাঁধে ব্যাগ কলেজ/স্কুল পড়ুয়া? বিশ্বাস না-হয় আমার কথা মিলিয়ে নেবেন। আমাদের ভয়ার্ত ডাকাডাকিতে মাঝে মাঝে হট্ হট্ করে এমন 'চাবড়াচ্ছে' ঘোড়াটাকে, যেন ওর উদ্দেশ্যই ঘোড়াসমেত আমাদের খাদে ফেলে দেওয়া। ভয় কাটাতে অনেকেই এই সময় খুব মিহি গলায় নিজের নিজের বাহনের সাথে আলাপ জমাতে চায়। সে-আলাপ অবশ্যই একতরফা। (সেই ভালো। নাহলে ভাবুন তো যদি কোনো একটা ঘোড়া ঘাড় ঘুরিয়ে বলত, "মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ না-ক'রে চুপচাপ বোস্ না! আর একটা টুঁ শব্দ করলে দেব খাদে ফেলে!") হায়ারার্কির ওপরের দিকে অবস্থান করেও নিজের থেকে অনেক নিচের দিকে থাকা কাউকে এভাবে তেল দেওয়ার ঘটনা আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় সচরাচর এক্সপেরিয়েন্স করা হয়ে ওঠে না। ঐ দেখুন তবে... "উউউ তুফান, সোনা আমার, ঐদিকে যায় না বাবু, এদিকে এদিকে, দেখো ওদিকে খাদ, এদিকটা সেফ...হ্যাঁ হ্যাঁ বিজলির পেছন পেছন চলো। এইতো ভালো ছেলে...আবার, আবার কি-হল... এ মাইরি খালি খাদের দিকে যায়, এর কি ঝাঁপলগ্নে জন্ম নাকি?"

বিশ্বাস করুন, আগেরবারও মনে হয়েছিল এই শেষ। কিন্তু ঐ যে রোমাঞ্চমাখা শিহরণ মনে থেকে গিয়েছিল, প্রিয় বন্ধুদের সাথে আবার তা ফিরে পেতে চেয়েছিলাম। পেলাম না কিন্তু। সকাল থেকে ঘোড়ার পায় পায় থকথকে কাদা প্রথমেই একটা ঘিনঘিনে ভাব তৈরি করেছিল। পুরো অঞ্চলটাই যেন এক প্রকান্ড ওপেন-এয়ার আস্তাবল। বছরের এই সময়টায় ফাগু ভ্যালিকে অক্লেশে 'হাগু ভ্যালি' বলা চলে। তবে সেটাই সব নয়। ধীরে ধীরে মনটা খারাপ হতে থাকল ওপরে গিয়ে। শেষ প্রান্তে 'কুফরি (কি-একটা-যেন) উন্নয়ন সমিতি' ১০ টাকা করে কুপন কাটে। আগেও ছিল, এখনো আছে। এবার আবার তার সঙ্গে দেখি 'ফাগু ভ্যালি (কি-একটা-যেন) উন্নয়ন সমিতি' গজিয়েছে। আবার ১০ টাকা/ঘোড়া। এটা কিন্তু এক্সট্রা। যাহোক, নামলাম তুফানের পিঠ থেকে। ফেরার পথে আবার অন্য ঘোড়া। এই একই কুপন দেখিয়ে। এবার ভ্যালির দিকের ঢাল বেয়ে তরতর করে নামতে লাগলাম। চারপাশে পাহাড় ঘেরা ছড়ানো ভ্যালিটা আমাদের সামনেই। নতুন করে দেখবার ইচ্ছা আশ্চর্য সেই বাটি-সদৃশ প্রান্তর। সেই গোলাপ বাগান। সেই ছোট ছোট লাজুক দোকান ঘর টুকিটাকির। সেই ভিউ পয়েন্ট। যেখান থেকে শুধু মাত্র হাতের অদ্ভুত আন্দাজে টেলিস্কোপ সঠিক অ্যাঙ্গেলে ঘুরিয়ে, আপেল বাগান, চিনের প্রাচীর 'স্পষ্ট' দেখান কিছু স্থানীয় জাদুকর; এমনকি মেঘলা দিনেও! আমি বিশ্বতার্কিক, চোখ রাখিনি দূরবীনে গতবার। বিশ্বাসই করে উঠতে পারিনি এই ঘন কুয়াশায় কিছু দেখতে পাব। কিন্তু নিজের চোখে দেখেছি, বোসবাবুর ছেলে পিলু সব স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল। মাথা নেড়ে নেড়ে হ্যাঁ হ্যাঁ বলছিল আগেরবার। আর আমি তার পাশটিতে দাঁড়িয়ে ঐ কুয়াশার মধ্যেই উঁকি-ঝুঁকি মেরেছিলাম মাইনাস পয়েন্ট সেভেন-ফাইভ পাওয়ারের চশমা চোখে। বোসবাবুর ছেলে পিলু আর আমি সেবার দাঁড়িয়েছিলাম পাশাপাশি, একেবারে খাদের ধার ঘেষে। এই কথাটা কেন বললাম? কেন বলুন তো এতোখানি আন্ডারলাইন করে আমাদের আগের অবস্থান বোঝাতে চাইলাম? কারণ আছে। এবার গিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম। ছড়ানো ভ্যালিটার এই দূরবীন দিয়ে দেখার অংশটা কেমন সরু মতো আরো একটু উঁচু হয়ে ভারি চমৎকার একটা ফালি তৈরি করেছে। ঐখানটা এমন যে দেখলেই মনে হবে গিয়ে ঐ ধারটাতে দাঁড়াই। টেলিস্কোপোওয়ালারাও ট্রাইপডের ওপর তাদের রোজগার দাঁড় করায় এই জায়গাটাতেই। এবার দেখলাম ঐ ফালিটুকুতে যাওয়ার পথের খানিক আগেই কাঁটাতার লাগিয়ে ঐ ফালিটুকু ঘিরে ফেলা। কাঁটাতারের ওপারে যাওয়ার একটা গেট করা, সেখানে টিকিট দেখিয়ে যেতে হবে। কিসের টিকিট? না, ঐ যে এপিঠ-ওপিঠ ল্যামিনেট করা A4 সাইজ পেপারে ছাপানো আছে, ঐসব দ্রষ্টব্যগুলো যদি ম্যাজিক টেলিস্কোপ দিয়ে আপনি দেখতে রাজি থাকেন তবেই আপনি গেটের ওপারে যেতে পারবেন। বাস্তবিকই আমার পেয়ারের ঐ জায়গাটায় ট্রাইপড আর টেলিস্কোপ যত দেখলাম ততজন পিলুকে দেখলাম না। বন্ধুকে যখন সেই দুঃখ বলছি কাঁটাতারের এদিকে দাঁড়িয়ে, ওপার থেকে টেলিস্কোপের মালিকরা মাথা খেয়ে ফেলছে তদবির-তাগাদায়। মনে হল একবার, ঘাড় ধরে দিই এদের কপালগুলো কাঁটাতারে ডলে!

না পেরে মুখ ঘুরিয়ে ফিরে আসছি, ভাবছি কেন এলাম, না আছে এবার সেই কনকনে হিমেল হাওয়া, না আছে রীতিমতো যত্ন করা সেই গোলাপ বাগান, না পাচ্ছি কোনো পাহাড়ি রম্য স্থানে ঘুরে বেড়াবার মতো এতটুকু ফুরফুরে আমেজ। এতো পুরোদস্তুর মেলা! শুধু দোকান দোকান দোকান। ভ্যালিতে আপনাকে স্বাগত জানাবে সার সার চাট-চাউমিনের দোকান। বিশালাকার গোলার মধ্যে মানুষকে পুরে গড়িয়ে দিচ্ছে। আনন্দ কই? শুধু যে ফুর্তির ফাগু ভ্যালি! ভাবছি কত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া যায় এখান থেকে, ওমনি গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস কমিটির ভাইয়েরা। আবার আরেক দফা ল্যামিনেটকরা তালিকা। এ পাহাড় থেকে তাদের স্পেশাল গাড়িতে করে পাশের পাহাড়ে নিয়ে যাবে, সেখানে সমস্ত বন্দোবস্ত। দোল খাওয়া, ঝোলা, দড়িতে হাঁটা, পায়ে দড়ি বেঁধে মরণ-ঝাঁপ ইত্যাদি ইত্যাদির প্যাকেজ। এই ফ্যাসাদে, ঐ 'প্যাকেজ' কথাটি কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; কারণ প্যাকেজের একদিকে 'ওদের প্রফিট' ও উল্টোদিকে 'আপনার পোষাল না' থেকে যেতেই পারে। আমরা আমাদের ঘোরানো মুখ আর ফেরালাম না। একেই ঘুসঘুসে জ্বরে যেন বিস্বাদ হয়ে আছে মুখ, আর গায়ে পড়ে সাধতে এসেছে, 'কেক খাবেন?' ধুত্তোর! এসেছি যখন, ঐদিকের টঙে ঐ মন্দিরটা আছে না, ওটা একবার ঘুরে দেখে আসি। মন্দিরটা একটু উঁচু জমিতে। সিঁড়ি ভাঙ্গতে হয় গোটা কতক। একটা মজা আছে। এদিক দিয়ে উঠে মন্দিরের চাতাল দিয়ে ওদিকে নেমে যাওয়া যায়, মন্দিরের বিগ্রহর সঙ্গে মোলাকাত না করেই। সেদিকেই যাচ্ছিলাম। যাওয়ার পথে মন্দিরের প্রায় গোড়ায় চেয়ার নিয়ে বসে আছে দুই স্থানীয় ভাই। কাছাকাছি হতেই জিজ্ঞেস করে বসল, "হরর্ হাউস মে যাইয়েগা?" খাটা পায়খানার থেকেও ছোটো সাইজের একটা তেড়াবেঁকা প্রকোষ্ঠের গায় নিদারুণ কঙ্কালের ছবিআঁকা কিছু একটা চোখে পড়েছিল এদিকে আসতে আসতেই। ভাব-সাব দেখে সঙ্গের বন্ধু জিজ্ঞেসই করে বসল, "অন্দর ভুত হ্যায় ভি, ইয়া আপলোগহি..." দু'পক্ষের কেউই ইন্টারেস্ট দেখায়নি আর। মন্দিরে উঠতে গিয়ে বাঁধা। মন্দির লাগোয়া নতুন সাব-মন্দির তৈরি হচ্ছে এবং তৎসহিত আনুদানের জন্য অনুরোধ। অ্যাবাউট টার্ন ও মন্দিরের পাশের ঝোপের মধ্যে দিয়ে পায়-চলা পথ ভেঙ্গে পেছনের খাদের পাশে গিয়ে দেখি সবুজ তারজালি দিয়ে ভ্যালির এ অংশ সুরক্ষিত করা। এখান থেকেই দেখতে পেলাম 'অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস'-এর অবাঞ্ছিত বোঝাখানা ঘাড়ে করে দাঁড়িয়ে আছে পাশের সেই হারকিউলিস পাহাড়টি। এখান থেকে সবই খেলনা খেলনা মনে হয়। কোন এক মোবাইল কোম্পানি এসেছিল ঐ পাহাড়ে সুউচ্চ টাওয়ার বসাতে। তার নিশান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা টাওয়ারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তারা চলে গেছে তাদের সিমেন্টের অফিস ঘর, স্টাফ কোয়ার্টার, গাছ কেটে সবুজ ঘাস লাগানো লন ফেলে রেখে। তাকেই অ্যাডভেঞ্চার পার্কের রূপ দেওয়া নির্ঘাত হিমাচল ট্যুরিজমের এক সফল

পদক্ষেপ। বেলা অনেক হল, খুব খিদে পেয়েছে। গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছনোর তাড়ায় আমরা ঘোড়ার খোঁজে গেলাম।

নালদেহ্‌রায় অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের আয়োজন

নালদেহ্‌রাঃ কুফরি থেকে গাড়ি যখন ছাড়ল তখন আমাদের মন, পেট দুটোই খালি। জানিনা আমাদের দেখে ড্রাইভার মহাশয় কিছু বুঝেছিলেন কিনা, আমাদের একবার অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের কথা জিজ্ঞেস করলেন, আর আমরা তৎক্ষণাৎ খারিজ করে দিলাম। গাড়ি এখন সিমলামুখী। হোটেল হয়ে যাওয়া 'রাজার বাড়ি চেইল' দেখতে উজিয়ে আরো ত্রিশ কিলোমিটার যাওয়ার কোনো ইচ্ছা দেখাল না কেউ। বরং গাড়ির মধ্যেই একটু একটু করে কথাটা ফেনিয়ে উঠল, 'এবার তবে নালদেহ্‌রা।' ড্রাইভার খুব একটা রাজি নয়। আমরা ক্রমশঃ নাছোড়। ড্রাইভারের সেই এক বাজারি চালু পদ্ধতি আমাদের ডিমোটিভেট করার, "এক্সট্রা টাকা লাগবে"। আমাদের মত - কেন লাগবে? আমরা তো বাকি আর কিছুই ঘুরছি না। ড্রাইভার নিজেই একখানা গোটা হোটেলের মালিক। ফ্রী টাইম, তাই গাড়ি চালাচ্ছে। ঠোঁটে পাতলা হাসিটা রেখেই বলল, "তো ঘুম্ লিজিয়ে না!" আসলে সেই ল্যামিনেট করা পেপারের লিস্ট অনুযায়ী জায়গাগুলো, সব যাতায়াতের রাস্তাতেই পড়ে থাকে। স্রেফ গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেখিয়ে দিলেই হল। সকাল বেলা গাড়ি রওনা করে সিমলার সব ড্রাইভার সিমলা শহর থেকে অল্প বাইরে এসেই এক বেমক্কা পাহাড়ের বাঁকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলবে, এই যে গ্রীন ভিউ পয়েন্ট। যান নেমে দেখে আসুন। আপনার গা ছুঁয়ে বলছি, ঠাহর করতেই সময় লাগবে যে এটাও একটা দ্রষ্টব্য! নাম-না-জানা পাহাড়ের খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে ওপারের পাহাড়ের গায়ে দেখুন কেমন সবুজ পাইন বন, গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে যেন ব্রিগেডে কোনো রাজনৈতিক সমাবেশে 'গ্রাম থেকে আসা' ভিড়। বাঁকের মুখটাতে আরো আরো গাড়ি এসে থামছে। ভিড় হয়। তাই খাদের দিকটায় রাস্তার ধার ধরে চা, টুপি, স্থানীয় গয়না ইত্যাদির স্টল। আপনি খানিক চিড়িক চিড়িক ফটো বা সেল্‌ফি তুলবেন। সঙ্গের সাথীদের গাড়ি থেকে নেমে আসতে অনুরোধ করবেন, সবাই রাজি নাও হতে পারে। খুব স্বাভাবিক। তারপর আপনি যদি ব্যাটাছেলে হন, গাড়ি, ভিড়, স্টল, কোলাহল এসব ছাড়িয়ে হেঁটে হেঁটে খানিক ফাঁকায় যাবেন। বন্ধুরা কেউ ভাববে আপনার ফটোগ্রাফির যা বাতিক, ভালো ভিউ খুঁজছেন। আবার কেউ ভাববে নির্জনে প্রকৃতি উপভোগ করতে চাইছেন খানিক। কেউ আবার খেয়ালও করবে না। আর ড্রাইভার একবার আড়মোড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বলবেই-বলবে পেছন থেকে, "জলদি আইয়েগা"। এসব হবেই হবে, কারণ এখানে আর কিছু হওয়ার নেই। আপনি ঠকে গেছেন। আপনি নিজে মনে মনে ভাবছেন, নামলামই যখন একবার করে নিই। গাড়ি, ভিড়, স্টলগুলোকে যখন বাঁকের আড়ালে ফেলে দিয়েছেন, আর মন-মত জায়গা খুঁজছেন, তখনই আবিষ্কার করবেন, ওমা! এদিকেও তো ছোট-খাটো একটা ভিড়, তবে শুধু ব্যাটাছেলেদের। সবাই সবার থেকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে।
যাক, বাজে কথা অনেক হল। আমাদের কথায় আসি। হল কি, কুফরি থেকে সিমলার দিকে সোজা ফিরে আসতে আসতে যেখান থেকে বাঁয় মোড় ঘুরতে হয়, ঠিক সেই পয়েন্ট থেকে মোড় না-ঘুরে আমরা যদি সোজা এগিয়ে যাই আরো ততখানি যতখানি পিছনে কুফরি, তাহলে পাব নালদেহ্‌রা - পাহাড়ের কোলে কেয়ারি করা এক সুরম্য বিশ্রামাগার বলা যেতে পারে। এখানে যেকোনো প্রকার শব্দ যেন ঢালে ঢালে গা-এলিয়ে চুপ। যে গাড়িতে সওয়ার হয়ে নালদেহ্‌রায়, সেও চুপ করে গেল সামান্য কিছু বেশি বখরায়। ড্রাইভাররা অভিজ্ঞ হন, তবে সবসময়ই আরো অভিজ্ঞ হয়ে ওঠার অবকাশ থেকে যায়। যেমন উনি ধারনায় আনতে পারেন নি, নালদেহ্‌রায় সিনেমার শ্যুটিং হয় এই তথ্য আমাদের খুব একটা রোমাঞ্চিত করবে না। বেলা তখন অনেকটা গড়িয়ে গেছে। একবার মনে হল হোটেলে লাঞ্চ পেলে হয়। আবার যদি শ্যুটিং পার্টি এসে থাকে তবে তো কম্মো-কাবার; সমস্ত খাবার সাবাড়!

নালদেহ্‌রায় ঘোড়সওয়ারি

গাড়ি থেকে নেমে প্রথমেই চোখে পড়ল ঘোড়া। তারপরেই ঘনিষ্ঠ হয়ে এল ঘোড়ার মালিক। ঘোড়া প্রতি ৬০০ টাকা। আমরা বেঁকে বসলাম ২০০ টাকায়। আসলে ওদের কাটাতে চেয়েছিলাম। এরপর চোখ ফেরালাম নালদেহ্‌রার দিকে। আর সত্যিই, চোখ ফেরাতে পারলাম না। এইযে পাহাড়ের প্রায় চুড়োয় আমাদের গাড়ি এনে ফেলেছে, এই পাহাড়টার মাথাটা বেশ ছড়ানো, আর ঢেউ খেলানো। এতোটাই ছড়ানো যে এর একপ্রান্তে এক পেল্লায় গল্‌ফ কোর্স রয়েছে। কিন্তু এখনই ওখানে যাব না। এই ঝকঝকে পিচঢালা রাস্তার ওপর দিয়ে শ্রান্ত অথচ শান্তি নিয়ে হেঁটে চলেছি, আর ঐ যে রাস্তাটা সামনেই বেশ বড় করে বাঁক নিয়ে এই ঢেউ খেলানো পাহাড়টার ওদিকে গায়েব... ঐ বাঁকটার কাছে যেতেই দেখি বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে আছে HPTDC-র আকারে প্রকান্ড রাশভারী এক রেস্তোরাঁ। ভীষণ ভীষণ খিদে নিয়েও ঢোকবার আগে একটু দোনামোনা করছিলাম আমরা। না-জানি কত দামী! খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে আসা এক ভদ্রলোক আমাদের ক্রস্ করে যাওয়ার সময় আশ্বাস দিয়ে গেলেন; আর আমরা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লাম। রাস্তার প্যারাবোলিক বাঁকের কোলটা জুড়ে নির্মিত, তাই ভারি উপযুক্ত ব্যবহার দেখলাম রেস্তোরাঁটির নির্মাণে। অর্ধচন্দ্রাকৃতি ডাইনিং রুমের ধনুকের মতো বাঁকানো অংশে সার সার অলিন্দ, একেকটি সুবিশাল ক্যানভাস যেন! প্রতিটির এপাশে বসবার ব্যবস্থা আর, বসে বাইরের দিকে তাকালেই, সামনের দেওয়াল জোড়া অশেষ প্রকৃতি। মোটামুটি ফাঁকাই ছিল। আমরা বাচ্চাদের মতো ২/৩ বার আসন বদলালাম শুধুমাত্র 'বেস্ট ভিউ' সম্পন্ন window sight টা নেওয়ার জন্য... ভাবুন একবার! এর বেশি বললে আবার মনে হতে পারে বিজ্ঞাপন, তবে জেনে রাখুন এ-যাত্রা নালদেহ্‌রা আমায় উচ্ছ্বসিত করেছে। মধ্যাহ্নভোজন পর্ব চলাকালীন একবার আমাদের গাড়ির ড্রাইভারের ফোন এল, "সর্‌জি, ঘোড়া লে লো, সস্তা কর দেঙ্গে, সাড়ে তিনশ দে-দিজিয়েগা এক ঘোড়েকা।" ৬০০টা সাড়ে তিনশোয়। আরো বলে রাখি, খাওয়া-দাওয়া শেষ করে যখন বেরোলাম, ড্রাইভার নিজে নিয়ে এল ঘোড়ার মালিক-কে আমাদের কাছে, ৩০০ টাকা/ঘোড়াও রাজি হয়ে গেল! সত্যি বলছি, আমরাও রাজি হয়ে যেতাম। এই মনোরম নিরিবিলি প্রায় ফাঁকা আঁকা-বাঁকা সবুজ প্রকৃতি-ঢাকা মোহময়ী উপত্যকা ঘোড়ায় চড়ে ধীরে ধীরে ঘুরে

ঘুরে দেখার অভিজ্ঞতা স্মৃতির ভান্ডারে এক নায়াব নাগমণি হয়ে রয়ে যেতে পারত। কিন্তু হয়নি তা। ভেতো বাঙ্গালী দিনে ক'বার ঘোড়ায় চড়বে? ট্যুর বাজেটের প্রসারণশীলতার ক্ষমতাও অতি সীমিত (এই বাজেট নামক চাদরটির যে কি ফালা ফালা অবস্থা ঘটেছিল সে প্রসঙ্গে আসব)। তাছাড়া অমন ভরপেট্টা গেলার পর সব কথা অত মাথা দিয়ে চিন্তা করা সম্ভবপর নয়, সেই সময় শরীরের বেশি ভাগ রক্ত উদরাংশে কর্মরত থাকে। তাই অবসন্ন মস্তিষ্কে আমরা '২০০ টাকা করে দেব' এই গোঁ ধরে থাকলাম। বিরসবদনে ঘোড়াওয়ালা বলে চলে গেল, "ঘুম লেতে সর্, করীব ৬ কিমি রাস্তা হ্যায়, ৩০০ জাদা নেহি থা, থোড়া অ্যাডজাস্ট কর লেতে!" যে সরু পায়েচলা চ্যাটালো পাথর বাঁধানো পথ রেস্তোরাঁর সামনে দিয়ে সরাসরি ঢালের চরাইয়ে উঠে গেছে আমরাও সেদিকে উঠে চললাম। নিজেদের মধ্যেই নানান রকম বাক্য বললাম, 'ড্রাইভারেরও ভাগ আছে', 'অনেকটা এক্সট্রা খরচ হয়ে যাবে', 'একবার তো চড়লাম ঘোড়ায়', 'আর শরীরে দিচ্ছে না, খাওয়ার আগে হলে তাও হোত', এমনকি 'নেক্সট টাইম এখানে এসেই ঘোড়ায় চড়ব' টাইপের ইত্যকার কথায় নিজেদের ভেত্তরকার 'হলে-বেশ-হত'টাকে চাপা দিতে দিতে উঁচু উঁচু পাইনের ছায়ায় ছায়ায় উঠে এলাম ঢালের মাথায়। আর প্রকৃতি আমাদের সব ক্ষেদ ভুলিয়ে দিল নিমেষে।

মিনিয়েচার গলফ্ কোর্স

খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি, বরফের সময় না-হলে ফাগু যাবেন না। সোজা নালদেহ্রা চলে আসুন। এখানে সময় কাটান। প্রকৃতি ছাড়াও রইল ঘোড়ায় চড়া, দড়িতে বাঁদর-ঝোলা হয়ে সোড়কে যাওয়া খাদের ওপর দিয়ে, ঝুলন্ত সাঁকোর ওপর দিয়ে হাঁটা ইত্যাদি অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস। রইল গল্ফ কোর্স। এখানে অ্যামেচারদেরও শেখানোর ব্যাবস্থা আছে। আরেকটু বুঝিয়ে বলি। গল্ফ কোর্সের এক পাশে একটা বড়সড় উঠোনের মাপের জায়গায় মিনিয়েচার গল্ফ কোর্স বানানো আছে সমস্ত রকম চিহ্নসহ। আমাদের মতো ট্যুরিস্টরাও দু'এক দান ট্রাই করতেই পারি ইন্সট্রাক্টরের সাহায্য নিয়ে। মেলায় যেমন বেলুন ফাটাই ১০ টাকায় ৬টা গুলি, সেইরকম। ১০টা পিট্ ১৫০ টাকা না কীযেন। আমাদের সময় সমস্তটাই বন্ধ ছিল। আপনারা চাইলে নেট থেকে তথ্য নিয়ে যাবেন প্লিZ। আমাদের তো প্রকৃতিই শুষে নিয়েছিল। গেলে তাড়াতাড়ি যান, কারণ মানুষও তো প্রকৃতিকে শুষে নিচ্ছে।

(ক্রমশ)

হিমাচলের তথ্য ~ হিমাচলের আরও ছবি

কাঞ্চন সেনগুপ্তের ছেলেবেলা কেটেছে ইস্পাতনগরী দুর্গাপুরে। কর্মসূত্রে কলকাতায়। ২০০০ সাল থেকে বেসরকারি কনস্ট্রাকশন ফার্ম সিমপ্লেক্সের সঙ্গে যুক্ত। ভালো লাগে লেখালেখি, ছবি তোলা, বেড়ানো। আবার কখনোবা সময় কেটে যায় ছবি আঁকা বা টুকিটাকি হাতের কাজে।

সাদা পাহাড়ের দেশের নীল নদী

মার্জিয়া লিপি

~ সোমেশ্বরীর আরও ছবি ~

সোমেশ্বরীর পাড়ে এসেই মনটা বাতাসে এলোমেলো হয়ে ভাসতে থাকে। নদী পাহাড়ের অপরূপ আরণ্যক সৌন্দর্যে বিমোহিত প্রকৃতি। মেঘ ঠেলে সূর্যের আলো এসে পড়ে সবুজ পাহাড়ে। আহা! কী স্নিগ্ধ নরম কাঁচা-পাকা সোনালি রোদ। নদীর পাড়ে দাঁড়ালে দেখা যায় ভারত সীমান্তের মেঘালয় রাজ্যের মেঘে ঢাকা সাদা-নীল আকাশের নীচে জলপাই রঙের গারো পাহাড়ের উঁচু-নীচু ঢেউ এর মতো দৃশ্য। নদীর দুপাশে বিস্তীর্ণ বালুতট। সোমেশ্বরী তার স্বচ্ছ পানি আর ধুধু বালুচরের জন্য বিখ্যাত। সুসং ও দুর্গাপুরের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে স্রোতস্বিনী সোমেশ্বরী।

সোমেশ্বরী নদীর আদি নিবাস ভারতের মেঘালয় রাজ্যে। মেঘালয়ের গারো পাহাড়ের বিঞ্চুরীছড়া, বাঙাছড়া প্রভৃতি ঝরনাধারা ও পশ্চিম দিক থেকে রমফা নদীর স্রোতধারা একত্রিত হয়ে সৃষ্টি সোমেশ্বরীর। মেঘালয়ের বঙ বাজার হয়ে রানিখং পাহাড়ের কাছ দিয়ে আমাদের দেশের নেত্রকোনা জেলায় প্রবেশ করেছে। বর্তমানে নদীটির মূলধারা তার উৎসস্থলে প্রায় বিলুপ্ত। বর্ষা মৌসুম ছাড়া অন্য মৌসুমে পানি প্রবাহও থাকে না। ১৯৬২ সালের পাহাড়িয়া ঢলে সোমেশ্বরী বরাবর দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে নতুন গতিপথের সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে এ ধারাটি সোমেশ্বরীর মূল স্রোতধারা। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা বিরিশিরি, সুসং ও দুর্গাপুর। নেত্রকোনা জেলার একেবারে উত্তরে অবস্থান বিরিশিরি, সুসং-দুর্গাপুরের। পাহাড়ের পায়ের নীচে কাঁচের মতো স্বচ্ছ নদীর পাড়ে বসে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ শুধু নয়, রয়েছে এখানে ইতিহাসের অমূল্য আকর। এখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে সোনালি অতীতের বেশ কিছু স্মৃতিচিহ্ন। এখানে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে প্রশিক্ষণের জন্য নির্মিত পিলার ও বিরিশিরি কালচারাল সেন্টার।

গারো পাহাড়ের নামানুসারে এখানকার আদিম আধিবাসীদের গারো বলা হয়। গারোদের পরিবার মাতৃপ্রধান। মেয়েরাই সংসারের হর্তাকর্তা। বিয়ের পর ছেলেরা চলে যায় শ্বশুরবাড়িতে। ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে উভয়েই মাঠে কৃষি কাজ করে। জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল অধিকাংশ গারো। ওয়াংলা ও কাওকারা তাদের প্রধান উৎসব। নিজেরাই তুলা থেকে সুতা তৈরি করে কাপড় বোনে এবং পোশাক তৈরি করে।

সুসং রাজ্যের গারো সভাপতি দুর্গার নাম থেকে এ এলাকার নামকরণ হয়েছে দুর্গাপুর আর সোমেশ্বরীর নাম হয়েছে রাজা পাঠক সোমেশ্বরের নাম থেকে। রাজা পাঠক সোমেশ্বর, বাইশা গারো নামের এক অত্যাচারী গারো শাসকের হাত থেকে এই অঞ্চলকে মুক্ত করেন। অশোক কাননে এক সিদ্ধপুরুষের নির্দেশে সোমেশ্বর নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং নদীটি পরিচিতি পায় সোমেশ্বরী নামে। একটি অশোক বৃক্ষ নির্দেশ করে তিনি বলেন, "দেখ যতদিন পর্যন্ত এই বৃক্ষটি জীবিত থাকবে ততদিন তোমার রাজ্যের কোনো অনিষ্ট আশঙ্কা নেই।" মহাপুরুষের সৎসঙ্গে ও সদুপদেশে এই রাজ্যের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা চিন্তা করে সোমেশ্বর তার এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যকে 'সুসঙ্গ' নামে অভিহিত করেন। এইভাবেই সুসঙ্গ রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন তিনি।

দুর্গাপুরে রয়েছে কিংবদন্তী সংগ্রামী বিপ্লবী মণিসিংহের বাড়ি। আদিবাসী-হাজং-গারোদের অধিকার আদায়ের ঐতিহাসিক পটভূমি দুর্গাপুর। উনিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশ দশকে মহাজনদের অমানবিক নির্যাতনের প্রতিবাদে মণিসিংহের নেতৃত্বে এখানে সংগঠিত হয় টংক বিরোধী আন্দোলন। সে আন্দোলনে প্রতিবাদের ভাষা ছিলো 'টংক প্রথার উচ্ছেদ চাই', 'জান দিব তবুও ধান দিব না','লাঙল যার জমি তার','জমিদার প্রথার উচ্ছেদ চাই।' টংক প্রথার মূল কথা ছিল ধানে খাজনা আদায়। টাকার পরিবর্তে ধানে খাজনার প্রথা জমিদার ও জোতদারদের জন্য ছিল লাভজনক। সে কারণে কৃষকরা ত্রিশের দশকের শেষের দিকে (১৯৩৭ সাল) ধানে খাজনার বদলে টাকায় খাজনা দেওয়ার নিয়মের জন্য টংক-বিরোধী আন্দোলন করেছিল।

সুসং দুর্গাপুরে ১৯০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন মণিসিংহ। জমিদার পিতা কালীকুমার সিংহ ছিলেন প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক। স্ত্রী কৃষকনেত্রী অণিমা সিংহ। ১৯৪৫ সালে নেত্রকোনায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কৃষক সভার ঐতিহাসিক সম্মেলনে তিনি ছিলেন অন্যতম সংগঠক ও সভাপতি। মণিসিংহের বাড়িতে রয়েছে স্মৃতিসৌধ। এই জমিদারপুত্র জমিদারির স্বার্থ না দেখে, দেখেছিলেন কৃষক, গারো, হাজংদের স্বার্থ।

সেসময়ে বিদ্রোহী আদিবাসীদের লাল রক্তে রঞ্জিত হয় সোমেশ্বরীর কাঁচের মত টলটলে নীল পানি। ১৯৪৬ সালের শেষ দিনে বিরিশিরির ক্যাম্প থেকে আসা সশস্ত্র পুলিশ হাজংদের বাড়ি তল্লাশির সময় মেয়েরা দা হাতে পুলিশকে তাড়া করে। ভয়ে পালিয়ে গিয়ে ক্যাম্পের জনা পঁচিশেক পুলিশ নিয়ে এসে তল্লাসি শেষে কুমুদিনী নামের বিবাহিত এক হাজং নারীকে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে সবাই পুলিশের দিকে বল্লম ছুড়তে থাকে। সংঘর্ষ বাধে। পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেয় রাশিমণি ও সুরেন্দ্র হাজং। সোমেশ্বরীর পাড়ে দু'জন পুলিশও মারা যায় সে সংঘর্ষে। তাই এই নদীর সঙ্গে মিশে রয়েছে স্থানীয়দের বেদনার স্মৃতি।

বিস্তীর্ণ বালুতট হেঁটে এসে নদীর কিনারায় এসে নৌকার অপেক্ষা। পাড়ের একপাশের সারাইয়ের জন্য পড়ে আছে মাঝারি একটি নৌকা। যাত্রী পারাপারের জন্য নদীতে ছোট ছোট বেশ কয়েকটি নৌকা রয়েছে। খরস্রোতা সোমেশ্বরী। পাহাড়ের বরফ গলা স্বচ্ছ, শীতল ধারা। নদীর স্বচ্ছ পানির নীচে ছোটবড় পাথর, নুড়ি ভেসে চলছে। মহাশোল মাছের বসবাস এই সোমেশ্বরীর স্বচ্ছ নীল পানিতে। টলমলে পানির নীচে পাথরের গায়ের সবুজ শৈবাল খেয়ে বেঁচে থাকে মহাশোল মাছ।
শিল্পীর পোর্ট্রেটে আঁকা নীল রঙের নদী সোমেশ্বরী। দূরে সবুজ পাহাড়, সাদা আসমানি নীল রঙের মিশেল আকাশে হেলান দিয়ে আছে। দেখে মনে হয়, সেই গানের কথা - যেন আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই..। সাদা মেঘগুলো পাহাড়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে। অপরূপ প্রকৃতিতে সোমেশ্বরীর সৌন্দর্য যোগ হয়ে অনন্য রূপ ধারণ করেছে। স্রোতস্বিনী পাহাড়ি নদীটির একপাশ শীর্ণ। দূরে বহু দূরে সাদা ফিতার মতো হয়ে বয়ে যায়। উঁচু-নীচু বিভিন্ন জলপাই রঙের গাছ অতন্দ্র প্রহরী হয়ে পাহাড়ের গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। পায়ে হেঁটেই পার হলাম এককালের পাহাড়ি দস্যি নদী। বহু বছরের টগবগে যৌবন আজ অনেকটাই স্তিমিত। অবশ্য আষাঢ় শ্রাবণে তীব্র জল আর স্রোতের উচ্ছ্বাস এসে ভরিয়ে দেয় দুকূল। সোমেশ্বরীর তখন অন্যরকম ভয়ঙ্কর রূপ।

আমাদের এক পাশে বিস্তীর্ণ বালুচর অন্যপাশে সোমেশ্বরী নদী সাপের গতিতে এঁকেবেঁকে বয়ে চলছে। ধুধু বালু রোদে ঝিকমিক করছে। বিজয়পুর সীমান্ত ফাঁড়ির দিকে গন্তব্য স্থির, রিকশা চড়ে উনিশ জনের দল। দু-তিনজন করে বেশ কয়েকটি রিকশায় পাড়ি দিচ্ছি গ্রামের পথ। আঁকাবাঁকা রাস্তা, বাঁশের ঝাড়, কোথাও ধানক্ষেত, রাস্তার মোড়ে বাঁশের টং-এ পান-বিড়ি-চা আর হরেক রকমের রঙবেরঙের মোড়কে বিস্কুট-কেক-চকলেটের বেসাতি। কাছেই রাণিখং গির্জা। মা মেরীর আর যিশুর ছবির পাশেই পাথরে খোদাই করা আছে গির্জার ইতিহাস। প্রায় একশো পঁচিশ বছরের পুরোনো এই গির্জা স্পেনের মিশনারিদের তৈরি করা। পাহাড়ের টিলার উপরে দাঁড়িয়ে আছে। বিস্ময় জাগে, এত অজগাঁয়ে শতবছরের পুরোনো ইট সিমেন্টের দেওয়াল, সিঁড়ি আর পাথরের স্মৃতিচিহ্ন দেখে। সিঁড়ি ভেঙে একটু ওপরে উঠে চারপাশে তাকাতেই মনটা আনন্দে নেচে ওঠে। পাহাড়-নদী-বালুতট আর গ্রামের সবুজ প্রকৃতি পেরিয়ে গির্জাটির সুন্দর স্থাপনা আর শান্ত-শীতল আমেজ বেশ নজর কেড়েছে সকলের। এই উঁচু জায়গা থেকে নেমে সীমান্তে বিজয়পুর ফাঁড়ির আশেপাশে সাদা মাটি পাওয়া যায়। আমাদের বিশাল কাফেলা এগিয়ে যায় সেদিকে। পথে একপাশে লাল শাপলার শীতল স্নিগ্ধ বিশাল এক দিঘি, পাড়ে নারকেল গাছের সারি। গারো পাহাড়ের পাশ দিয়ে বেশ অনেকদূর ছাড়িয়ে আমরা চিনামাটির পাহাড়ের দেশে।

আধাপাকা রাস্তা, কখনো বাঁশঝাড়ের মাঝদিয়ে মাটির সরু পথ পেরিয়ে প্রায় আধাঘন্টার রাস্তা শেষে দৃষ্টিসীমায় এবার সাদামাটির পাহাড়। রানিখংয়ের পাশেই বিজয়পুর সীমান্ত ফাঁড়ি, বিডিআর ক্যাম্প। এই বিজয়পুরেই রয়েছে চিনামাটির পাহাড়ের টিলা। যা দিয়ে চিনামাটির থালা, কাপ-পিরিচ-ফুলদানি ইত্যাদি তৈরি হয়। শ্রমিকরা মাটি তুলছে। হালকা বিভিন্ন রঙের মিশেল মাটি আর তা থেকে আলাদা করে রাখছে সাদামাটি। কিছু মাটি কাগজে মুড়ে সুভ্যেনির হিসেবে ব্যাগে রেখে এগিয়ে চলি স্থানীয় পুটিমারী বাজারে। পাশেই একটি সেমিনারি, খৃষ্টধর্মাবলম্বী ফাদারদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
ফিরে আসার তাড়া। সূর্য মধ্য আকাশ থেকে হেলে পড়ছে পশ্চিমের দিকে। তবে ফেরার আগে বাজারে সেরে নিলাম দেশি মুরগির ঝাল ঝোলে দুপুরের খাবার। গাঢ় সবুজ আর জলপাই রঙের বনানী, দূরের নীল পাহাড় আর স্রোতস্বিনী পাহাড়ি নদী সোমেশ্বরীর সৌন্দর্য বুকে নিয়ে ফিরে এলাম বিরিশিরি থেকে। আবারও চা-পানি খেয়ে যাত্রা ময়মনসিংহ থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে। সেদিন ছিল পূর্ণিমার পরের দিন - আকাশে ছিল এত্তো বড় এক বিশাল চাঁদ। চাঁদের রূপালী স্নিগ্ধ আলোতে শালবনের মাঝখান দিয়ে তিস্তা এক্সপ্রেসের কু-ঝিক ঝিক কু-ঝিক ঝিক শব্দে রাতের নিস্তব্ধতা আর নির্জনতা ভেদ করে ফিরে এলাম ভোরের আবছা আলোতে কমলাপুর রেল ষ্টেশনে। ভাবতেই মন খারাপ লাগছিল বিভিন্ন রঙের - সাদা, গোলাপি পাহাড়, জলপাই রঙের গাছপালা, গাঢ় নীল আকাশ, পাহাড়ি কাঁচের মতো স্বচ্ছ নদী সোমেশ্বরী আর স্বপ্নলোকের যাত্রাপথে দ্রুতগামী রেলে চড়ে শালবনের মাঝখান দিয়ে এসে অবশেষে আমাদেরকে ডুবে যেতে হবে মহানগরীর কোলাহলে, জনঅরণ্যে, জনস্রোতে।

~ *সোমেশ্বরীর আরও ছবি* ~

লেখিকা ও পরিবেশবিদ মার্জিয়া সরকারি কাজের সূত্রে এবং ভালবাসার টানে নিয়ে ঘুরে বেড়ান বাংলাদেশের আনাচেকানাচে। প্রকৃতি, মানুষ, সমাজ নিয়ে সেই অনুভূতির ছোঁয়াই ফুটে উঠেছে তাঁর কলমে। প্রকাশিত বই 'আমার মেয়েঃ আত্মজার সাথে কথোপকথন।'

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

ধান্যকুড়িয়ার সন্ধানে

অভিজিৎ চ্যাটার্জী

~ *ধান্যকুড়িয়ার আরও ছবি* ~

সুমিত্রর ফোন : "কি রে কাল সকালে যাবি নাকি ? এই কাছেই।"
আশ্চর্য হয়ে বলি : "কোথায় রে?"
একটু ঝাঁজের সঙ্গে সুমিত্র বলল : "গেলেই দেখতে পাবি, ব্যাটা।"
"আমি আর তুই?" জানতে চাই।
" হুঁ! হুঁ! তোর জন্য সারপ্রাইজও থাকবে।" সুমিত্র বলল।
সুমিত্র আমার স্কুলের বন্ধু, ভীষণ আনপ্রেডিক্টেবল। একটু টেনশন যে হচ্ছিল না, তা বলব না। কী জানি কী সারপ্রাইজ দেবে!
সকাল বেলায় বাড়ির তলায় গাড়ির হর্ন!! সুমিত্র হাজির, তখন কটা বাজে...৭ টা হবে।
গাড়ির দরজা খুলে অবাক - আরে রণজিৎ বসে আছে!
সুমিত্রর মুখে মিটি মিটি হাসি, কি রে সারপ্রাইজটা কেমন হল ??
স্কুলের বন্ধু আমরা। একসঙ্গে কত শৈশবের দিন কাটিয়েছি, সেইসব গল্প করতে করতে, বারাসাত থেকে টাকি রোড ধরে এগিয়ে চললাম বসিরহাটের দিকে।

গাইনদের বাগানবাড়ির সিংহদুয়ার

দেগঙ্গা, বেড়াচাঁপা ছাড়িয়ে একটু এগোতেই চোখে পড়ল, ইউরোপিয়ান স্টাইলে তৈরি একটি সিংহদরজা - দুটি স্তম্ভ আছে তাতে - মাঝের আর্চে গ্রীকদেবতা যুদ্ধে রত সিংহের সঙ্গে। রণজিতের অবজারভেশন খুব ভালো। বলল - ভালো করে দেখ, সিংহ মূর্তি দুটো-ই কিন্তু কীরকম লড়াইয়ের মুডে - ইউরোপিয়ান স্টাইলে তৈরি।
সাইনবোর্ড চোখে পড়ল," No Entry Without Permission"। একটা অনাথ আশ্রমের নোটিশ বোর্ডও টাঙানো।
"কী রে, কী করব? ঢুকব?"
সুমিত্রর সপাট উত্তর : "চল না। আমরা কি জঙ্গি?"
আমাদের ঢুকতে দেখে দুজন এগিয়ে এলেন, "কোথায় যাবেন? এখানে তো ঢোকা বারণ।"
সুমিত্র আর রণজিৎ চোখের নিমেষে ম্যানেজ করে নিল তাঁদের। কিন্তু বেশি সময় কাটানো যাবে না বলে দিলেন।
দু'পা এগোতেই চোখে পড়ল ইংরেজদের দুর্গের আকারে এক বিশাল বাড়ি! সামনের পুকুরে তার প্রতিচ্ছবি পড়েছে।
আরে, আমরা কোথায় এসেছি এখনও তো আপনাদের জানানোই হয়নি।
ঠিকই ধরেছেন জায়গাটার নাম 'ধান্যকুড়িয়া'। বসিরহাটের কাছে একটি ছোট জায়গা। এখানে ছড়িয়ে আছে ইউরোপীয় ঘরানায় তৈরি প্রাচীন কিছু জমিদার বাড়ি।
রণজিৎ বলে উঠল আরে, এতো "উইক-এন্ডের আরশিনগর।"

এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটি স্থানীয় গাইন পরিবারের বাগানবাড়ি। বহুপূর্বে এখানকার জমিদার ছিলেন গাইনরা। এই বাড়িটিকে তাঁদের গ্রীষ্মকালীন আবাস হিসাবে ব্যবহার করতেন। প্রায় দুশো বছর আগে গাইনদের জমিদারি গড়ে ওঠে গোবিন্দচন্দ্র গাইনের হাত ধরে, তাঁর অতীত নিবাস ছিল কলসুর-এ। বাংলায় তখন ব্রিটিশরাজ, পাট শিল্পের রমরমা, ব্রিটিশদের সঙ্গে ব্যবসা করে গোবিন্দচন্দ্র প্রভূত অর্থসম্পত্তি করেন। এই ব্যবসা আরও লাভের মুখ দেখতে শুরু করে তাঁর সুযোগ্য পুত্রদের হাত ধরে। তাঁরা হলেন - ক্ষীরোধর, নফরচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার। গাইন পরিবারের জমিদারি ছড়িয়ে পড়ে উত্তর চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন জায়গায়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে জমিদার মহেন্দ্রনাথ গাইন এটি তৈরি করেন। যদিও বাড়িটি সম্পূর্ণ করে উঠতে পারেননি এই পরিবার। থাকাও হয়ে ওঠেনি তাঁদের। কারণটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের কারণে ইতালীয়

মার্বেলের মেঝে করে উঠতে পারলেও বেলজিয়াম থেকে কাচ আর এসে পৌঁছায় নি, তাই জানলার কাচ লাগানো আর হয়ে ওঠেনি।

"দেখ, অনেকটা উইন্ডসর কাসেলের মতো দেখতে!" সুমিত্রর কথাতে খেয়াল হল, সত্যিই তো! বাড়ির বারান্দা আর প্রবেশ পথের আর্চগুলিতে যেন তেমনই আদল। বাড়িটির ডানদিকে, ওপরের দিকে তাকালে একটি গোল ফাঁকা জায়গা চোখে পড়ে, দেখে মনে হয় কোনও সময় হয়ত কোনও বড় ঘড়ি লাগানো ছিল বা এমন হতে পারে যে, ওটি হয়তো গাইন পরিবারের "প্রতীক" ছিল। এই পরিবারের আশুতোষ গাইন ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে "রায়বাহাদুর" খেতাব পেয়েছিলেন। বাড়িটির বাঁদিকে চোখে পড়ল ব্রিটিশ দুর্গের আকারে তৈরি একটি স্তম্ভ। একটু ইতিহাসে চোখ বুলিয়ে নিই। ১৭৪২ সালে জগন্নাথ দাস প্রথম ধান্যকুড়িয়ায় তাঁর পরিবার নিয়ে বসবাস শুরু করেন। তার আগে এটি ছিল সুন্দরবনের অন্তর্গত এক জঙ্গুলে জায়গা। একে একে মন্ডল, গাইন, শাহু, বল্লভ নামের বণিকরা বসবাস শুরু করেন। তৎকালীন সময়ে এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন খুব ধনী। ব্যবসা মূলত ধান ও আখের। ধর্মে সকলেই ছিলেন বৈষ্ণব।

গাইনদের বাগানবাড়ি - যেন প্রাচীন ব্রিটিশ দুর্গ

গাইনদের বাড়ি

ধান্যকুড়িয়াতে ঢুকে প্রথমেই চোখে পড়ে, গাইন পরিবারের গোলাপি রঙের বাড়ি। ইংরেজি 'এল' আকৃতির বাড়িটির স্থাপত্য ভারতীয় ও ইউরোপীয়ান ঘরানার এক অপূর্ব মিশেল। কতগুলি লোনিয়ান স্তম্ভ ও একটি লম্বা, খোলা অলিন্দ, যা দিয়ে হেঁটে গেলে প্রবেশ করা যায় ঘরগুলিতে। প্রায় একুশটি স্তম্ভ আছে। তিনটি ভাগে ছড়িয়ে আছে প্রাসাদোপম বাড়িটি। প্রতি তলায় তিরিশটি করে ঘর আছে, দুটি তলা মিলিয়ে ষাটটি ঘর। বাড়িটির শেষ প্রান্তে ছাদের ওপর চোখে পড়ে আভিজাত্যের প্রতীক দুটি বিশালাকৃতি ডোম। বাড়িতে প্রবেশ করলে চোখে পড়ে "নজর মিনার", যার প্রতিটি কোনায় রয়েছে করিন্থিয়ান স্তম্ভ। কিন্তু যেটি অবাক করে, প্রথম দুটি তলে গোলাকার আর্চ থাকলেও ওপরের তলটিতে কিন্তু রয়েছে ইসলামিক ঘরানার আর্চ। অনেকে এটিকে আবার নহবতখানাও বলেন। তবে এই বাড়িতে ভ্রমণার্থীদের প্রবেশ নিষেধ, পরিবারের লোকজন এখনও এখানেই বসবাস করেন। গাইনদের বাগানবাড়ি ছাড়িয়ে ধান্যকুড়িয়া-বেনেপারা রোড ধরে একটু এগিয়েই বাঁদিকে চোখে পড়ল গোলাপি রঙের ধান্যকুড়িয়া হাইস্কুল।

গোপীনাথ গাইন-এর হাত ধরে গড়ে ওঠে আজকের গাইন পরিবার। গুড়, পাটের ব্যবসায় সঙ্গী হিসাবে নেন বল্লভ ও সাহুদের। গোপীনাথ গাইনের পুত্র মহেন্দ্রনাথ গাইন এই বাড়িটি গড়ে তোলেন, তাও প্রায় ১৭৫ বছর আগে। ব্রিটিশদের সঙ্গে পাটের ব্যবসায় প্রচুর লাভ করেন। ধান্যকুড়িয়াতে গড়ে তোলেন চালের কল। শুরু করেন বর্ণাঢ্য দুর্গাপূজা, যা আজও হয়ে থাকে। বহু চলচ্চিত্রের শুটিং হয়েছে এখানে। গাইন ম্যানসন এর ঠিক পাশেই রয়েছে পরিবারের দেবতা "শ্যামসুন্দর জিউ"-র মন্দির। মন্দিরটিও 'এল' আকৃতির ও হালকা গোলাপি রঙের, দেবতার প্রতিষ্ঠা হয় ১৮২১ সালে।

গাইন ম্যানসন থেকে বেরিয়ে উল্টো দিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে চললে, ডানদিকে চোখে পড়বে সাদা রঙের সাহুদের বাড়ি। বাড়িটির দেয়াল জুড়ে করিন্থিয়ান স্তম্ভের কাজ আর জানলার ওপরে প্লাস্টার এর কারুকার্য। জানলার আর্চগুলিতে রঙিন কাঁচ। তবে জানলার ওপরে প্লাস্টারের কারুকার্যগুলির মধ্যে ব্রিটিশ ঘরানার ছাপ স্পষ্ট। বাড়িটির ঠাকুরদালানের স্তম্ভগুলি ও দরজার ওপরের কারুকাজগুলি অনবদ্য। এই বাড়িসংলগ্ন রাধাকান্ত মন্দিরটি প্রতীকচন্দ্র সাহু তৈরি করেন। যদিও বর্তমানে সাহু পরিবারের কেউই এই বাড়িতে বসবাস করেন না। তবে কেয়ারটেকার আছেন, সদালাপী ভদ্রলোক। গাইন ও বল্লভ পরিবারের মতোই ১৮৮৫ সালে এঁরাও ছিলেন ধান্যকুড়িয়ার জমিদার। উপেন্দ্রনাথ সাহু মহেন্দ্রনাথ গাইনের সঙ্গে এখানে প্রথম ইংরেজি স্কুল গড়ে তোলেন। মেয়েদের স্কুলও গড়ে তোলেন এঁরাই।

সাহুবাড়ির ঠাকুরদালান

সাহুদের বাড়ির সামনের রাস্তা ধরে একটু এগোলেই ডানদিকে কোনায় চোখে পড়বে ভেঙে পড়া নেতাজির এক মূর্তি, একটু এগোলেই সামনে পড়বে একটি পুকুর, বাঁদিকে চোখে পড়বে দোতলা বল্লভ পরিবারের বাড়ি।
শ্যামাচরণ বল্লভ পাটের ব্যবসা করে প্রভূত অর্থের অধিকারী হয়ে ওঠেন। তিনি স্বভাবে ছিলেন ভীষণ দয়ালু ও সদালাপী। শ্যামবাজারে এখনও এনাদের বাড়ি আছে। শ্যামাচরণ বল্লভ-এর হাত ধরেই গড়ে ওঠে এই ম্যানসন। গাইনদের সমসাময়িক।

পুতুল বাড়ি - বল্লভ বাড়ি

প্রাসাদোপম বাড়িটি সাদা ও সবুজ রঙা। প্রবেশের মুখে রয়েছে বহু অলঙ্কৃত একটি লোহার গেট, এটিও সবুজ- সাদা রঙের। বাড়িটির সম্মুখভাগে নজর কাড়ে করিন্থিয়ান স্তম্ভগুলির সমাহার, আর যা আকর্ষণ করে তা হল, প্লাস্টারের স্টাক্কোর কাজ। দোতলার অলিন্দটি পুরোটাই কাঠের জানলা দিয়ে ঘেরা। সামনে রয়েছে একটি সুসজ্জিত বাগান। ছাদের ওপরে রয়েছে বিভিন্ন আকৃতির বিভিন্ন মূর্তি, তাই স্থানীয়রা এই বাড়িটিকে "পুতুল বাড়ি"-ও বলেন। ছাদের প্রতিটি কোনায় ইউরোপিয়ান স্টাইলের একটি করে মূর্তি। বাড়ির প্রবেশ পথটির মধ্যে রোমান ঘরানার কাজ চোখে পড়ে, এর ওপরে দুটি দ্বাররক্ষীর মূর্তি। বল্লভ ম্যানসন যেখানে শেষ হয়েছে, বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে হলুদ রঙা নজর মিনার চোখে পড়ে। অনেকটা গাইন ম্যানসনে যেরকম আছে, এই নজর মিনারের ছাদের ওপরে দুটি মূর্তি আছে। হয়তো আরও কয়েকটি ছিল, যা কালের নিয়মে হারিয়ে গিয়েছে।

এই রাস্তা ধরে আর একটু এগোলে ডানদিকে চোখে পড়ে ত্রিতল রাসমঞ্চ, যার নয়টি মিনার আছে। এখানে রাধাকৃষ্ণের একটি মূর্তি আছে। এই মন্দিরের একতলায় প্রতি দিকে পাঁচটি করে প্রবেশপথ, প্রতিটির মাথায় রয়েছে একটি আর্চ। অতীতে ধান্যকুড়িয়াতে বৈষ্ণব ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।
রাসমঞ্চ ছাড়িয়ে ওই একই রাস্তা ধরে এসে পড়লাম সাহুদের বাগানবাড়ি। দুটি স্তম্ভের মাঝখান দিয়ে প্রবেশ করলাম বাগানবাড়িতে। অতীতে এটি ছিল সাহুদের গ্রীষ্মকালীন আবাস। গাইনদের বাগানবাড়ির মতোই এই বাগানবাড়িটি বেশ বড়, কিন্তু গাইনদের বাগানবাড়িটি বেশি ভালো লেগেছিল।

রাসমঞ্চ

এই ঐতিহ্যশালী বাড়িগুলিতে আজও দুর্গা পূজা হয়, আজও গাইন পরিবারের দুর্গাপুজোতে, অষ্টমীর সন্ধি পুজোর সময়, চারটি গান স্যালুট-এর প্রচলন আছে। একশো আট প্রদীপের আলোয় সেজে ওঠে এই বাড়ি, সেই রঙিন দিনগুলোর আবেশে।
ফিরে আসতে আসতে ভাবছিলাম, কালের স্রোতে কে যে কোথায় চলে যায়, রয়ে যায় শুধু স্মৃতিচিহ্নটুকু, যা বয়ে নিয়ে যায় ইতিহাসের ধারা।

বল্লভদের বাড়ি

~ *ধান্যকুড়িয়ার আরও ছবি* ~

অভিজিৎ চ্যাটার্জী পেশাগত ভাবে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার। আর নেশা ভ্রমণ। নেশার তাগিদে ঘুরে বেড়িয়ে নির্মাণ করেন পর্যটন কেন্দ্রগুলি নিয়ে বিভিন্ন ট্রাভেল ডকুমেন্টারি।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly , please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory .

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-18 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

পায়ে পায়ে ডাবলাহাগাং

অর্ণব ঘোষ

জোংরি-গোয়েচা লা ট্রেক রুট ম্যাপ // *জোংরি ট্রেকের আরো ছবি*

"চল ছোট্ট করে কোথাও ট্রেক করে আসি," জয়ন্তদার কথাটা যেন কানে অমৃতবাণী শুনিয়েছিল। গত কয়েকমাস কঠিন অসুখে ভোগার পর এভাবে হঠাৎ হিমালয়ের সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগ খানিকটা হাতে চাঁদ পাওয়ার মত। আমার ক্লাব "মাউন্টেন কোয়েস্ট অফ ক্যালকাটা"-র পোড়খাওয়া পর্বতারোহী, আমার পাহাড়ি দাদা জয়ন্তদা অবশেষে "জোংরি" পর্যন্ত ট্রেক করবে বলে ঠিক করল।
পশ্চিম সিকিমের এক অতি পরিচিত এবং সুন্দর ট্রেকিং পথ হল "ইয়াকসাম-গোয়েচা লা" ('লা' মানে পাহাড়ি পথ, গিরিপথ), সুন্দরী কাঞ্চনজঙ্ঘাকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ। তবে সময়ের অভাবে এযাত্রা "জোংরি" অবধি যাওয়া ঠিক হল। পাকা রাস্তা ধরে শেষ গ্রাম ইয়াকসাম, এখান থেকেই হাঁটা পথ শুরু হয়। সঙ্গী হল আমার বন্ধু বাপ্পা, সুমিতদা, মিলনদা ও ভাই অনিমেষ। বাপ্পা, সুমিতদা ও মিলনদার এটাই প্রথম ট্রেক। অবশেষে পূর্বনির্ধারিত দিনে ট্রেনে করে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে গাড়ি ঠিক করে যাত্রা শুরু করলাম ইয়াকসাম এর উদ্দেশ্যে। এক অদ্ভুত আনন্দ মনে চেপে বসেছে। শিলিগুড়ি শহর ছাড়িয়ে গাড়ি উত্তরের পথ ধরল, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সেই মসৃণ চেনা পথ। সেই প্রথম দেখা হওয়ার আবেগ যেন আবারও ফিরে আসছে। একরাশ ভাবনা শেষ না হতেই অবশেষে দেখা হল তার সঙ্গে, দিগন্ত বিস্তৃত অপরূপা হিমালয়। ঘোর কাটতে বুঝলাম আমি আবারও একবার হিমালয়ের কোলে ফিরে আসতে পেরেছি, যেন ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন শেষ হয়ে দিনের আলোয় পৌঁছানো। করোনেশন ব্রিজ (সেবক ব্রিজ) পাশে রেখে সেবক কালী মন্দির পেরিয়ে সর্পিল পথে গাড়ি এগিয়ে চলল, সঙ্গী হলো খরস্রোতা তিস্তা। কিছু পরেই 'মেল্লি', স্বর্গরাজ্য সিকিমে প্রবেশ করলাম। গাড়ি থামল সন্ধে সাতটা নাগাদ - ইয়াকসাম। বাইরে তখন বৃষ্টি।

দিগন্তবিস্তৃত হিমালয়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া তিস্তা

সুন্দরী কাঞ্চনজঙ্ঘার পাদদেশে প্রায় ১৭৮৫ মিটার উচ্চতায় ইয়াকসাম একটি ছোট্ট, ছবির মত লোকালয়, প্রায় তিনশো বছর আগে এটা সিকিমের প্রথম রাজধানী ছিল। এখন অন্যতম একটি পর্যটন স্থল ও গোয়েচা লা ট্রেক-এর বেসক্যাম্প। আমরা উঠলাম প্রধান সাহেবের হোটেল "হোটেল প্রধান"-এ। প্রধানবাবুর সহায়তায় স্থানীয় প্রশাসনের থেকে অনুমতি জোগাড় ও বাকি কাজ সেরে দরকারি জিনিসপত্র কেনাকাটা সেরে নিলাম। খাওয়া দাওয়ার পর এবার শান্তির ঘুম। বাইরে তখনও বৃষ্টি অবিরাম। প্রথম দিন আমাদের গন্তব্য 'বাখিম'। সকালে উঠে দেখলাম বৃষ্টি এখনও অক্লান্ত। তবে তার মধ্যেই স্থানীয় থানায় কাগজপত্র সইসাবুদ করা ও বনদপ্তর থেকে অনুমতি নেওয়ার কাজ সেরে ফেলা হল। এখান থেকেই শুরু হচ্ছে "কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্ক", তাই বনদপ্তরের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। ইতিমধ্যে আমাদের গাইড ও পোর্টার ভাইরাও হাজির। খাবার ও তাঁবু ইত্যাদি ভারী জিনিস ওঁদের দায়িত্বে দিয়ে নিজেদের রুকস্যাক পিঠে নিয়ে অবশেষে হিমালয়ের কোলে যাত্রা শুরু করলাম।

কৃত্রিম পৃথিবী ছেড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রকৃতির কোলে পৌঁছে গেলাম। নিবিড় জঙ্গল, প্রায় কর্দমাক্ত পথ, নাম না জানা বহু পাখির কলরব, অবিরাম হয়ে চলা ঝিরিঝিরি বৃষ্টির সুর, মনটা চনমনে হয়ে উঠল। অবশ্য শীঘ্রই বুঝলাম গত কয়েকমাসের অসুস্থতা কতটা প্রভাব ফেলেছে শরীরের ওপর, বুকের ভেতর হাপর চলতে লাগল। ক্রমাগত চড়াই, বৃষ্টিতে পিচ্ছিল ও কর্দমাক্ত পথ আরও কঠিন করে তুলছে এগোনো। শুরুর কিছু সময় পেরিয়ে অবশ্য শারীরিক কষ্ট অনেকটা আয়ত্তে এসে গেল, পাহাড়ের ভাষায় যাকে 'অ্যাক্লাইমাটাইজ' হওয়া বলে।
জঙ্গল পথে চড়াই-উতরাই পেরিয়ে পৌঁছলাম 'সাচেন,' পথের পাশে বেশ কিছুটা জায়গা সমতল, একটি পুরনো বিশ্রামাগারও রয়েছে। বৃষ্টির কারণে পুরো জায়গাটা কাদাভর্তি, স্যাঁতসেতে আবহাওয়া পেয়ে জোঁকেরাও বেশ ভালই উপস্থিতি জানান দিচ্ছে। অনেকে এখানেই প্রথম রাত কাটায়, তবে আমাদের গন্তব্য 'বাখিম।' ইতিমধ্যে আমরা পেরিয়েছি তিনটি সেতু। পাহাড়ি পথে সেতু মানে একবার উতরাই পথে অনেকটা নেমে আসা, সেতু পেরিয়ে আবার চড়াই ওঠা। সাচেন-এ একটু বিশ্রাম নিয়ে আবারও এগিয়ে চললাম, ঘন মেঘ ঢেকে রয়েছে, টিপটাপ বৃষ্টির শব্দ, নীচ দিয়ে সশব্দে বয়ে চলেছে 'রাথং চু' (চু মানে নদী), অদ্ভুত মোহময় এক পরিবেশ। এসে পৌঁছলাম চতুর্থ ও সবচেয়ে বড় সেতুর সামনে। এরপরেই শুরু হবে একটানা খাড়া চড়াই পথে উঠে যাওয়া, 'বাখিমের চড়াই' নামে যা পরিচিত। নদী এখানে প্রচন্ড খরস্রোতা। নীচে চোখে পড়ল একটি প্রকান্ড গাছের গুঁড়ি আড়াআড়ি নদীবক্ষে রাখা, সেতু হওয়ার আগে যা নদী পেরোনোর জন্যে ব্যবহার করা হত। প্রযুক্তিকে অনেক ধন্যবাদ যে

এখন অত নীচ পর্যন্ত আর উতরাই-চড়াই করতে হয়না।

কাঞ্চনজঙ্ঘা জাতীয় উদ্যানের প্রবেশদ্বারে ফোটোসেশন

বৃষ্টিটা অবশেষে ধরেছে। সর্পিল পাকদন্ডি বেয়ে মাধ্যাকর্ষণ বলের সঙ্গে লড়াই করে একটানা কঠিন চড়াই ভেঙে অবশেষে বিকাল ছটা নাগাদ পৌঁছলাম 'বাখিম।' না কোনও জনপদ নয় এটা, রাস্তার দুপাশে একটু প্রশস্ত জায়গা। পুরনো একটি বাংলো রয়েছে বনদপ্তরের, শেষবার ভূমিকম্পতে যা চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় পাহাড়ি বন্ধুরা যারা ওই এলাকায় নানারকম কাজে আসে তাদের জন্য একটি 'হাট' রয়েছে ওখানে। সেখানে আমরা কিছুটা জায়গা পেলাম রাতের রান্না করার জন্য। আমাদের পোর্টার বন্ধুরা অবশ্য আমাদের আগেই ওখানে পৌঁছে বিশ্রাম করছে।

রাথং চু-র উপরে চতুর্থ সেতু

এরপর বনদপ্তরের বাংলোর সামনের খোলা জায়গায় তাঁবু লাগিয়ে লেগে পড়লাম রান্নার কাজে। ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভেতর মাথায় লাগানো 'হেড টর্চ'-এর সামান্য আলোয় রান্না করা প্রথমবার ট্রেকে আসা বন্ধুদের জন্যে সারাদিনের ক্লান্তির পর এক দারুন অনুভূতি। খাওয়াদাওয়া সেরে ক্লান্ত শরীর নিয়ে ঢুকে পড়লাম স্লিপিং ব্যাগের উষ্ণ আশ্রয়ে। হিমালয়ের কোলে অপার নিস্তব্ধতাকে জড়িয়ে বড় শান্তির ঘুম।

দ্বিতীয় দিন শুরু হল মোহময়ী প্রেক্ষাপটে, ঘুম ভেঙে তাঁবুর দরজা খুলতেই সামনে পেলাম সেই নৈসর্গিক দৃশ্য যার জন্যে বারবার বাখিমের চড়াই ভাঙা যায়। হিমালয়ের গায়ের সবুজ গালিচা যেন সূর্যের আলোয় নিজেকে সেঁকে নিচ্ছে। পরিস্রুত অক্সিজেন, ঝকঝকে আবহাওয়া যেন শরীর-মন তরতাজা করে তুলল।

বাখিমে তাঁবু পাতার স্থান

আজ যাব 'ফেডাং', ৩৬৯৬ মিটার, কয়েক ঘন্টার পথ। প্রাতঃরাশ সেরে দুপুরের খাবার বানিয়ে সঙ্গে নিয়ে নিলাম, পথিমধ্যে খাওয়া হবে। ইতিমধ্যে বাপ্পা ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে বাকি পথ এগোনোর সাহস পেলনা ও। তাঁবু আর অন্যান্য সামগ্রী গুছিয়ে রওনা হলাম আমরা।

না, আমার জন্যে আজ শুরুটা ভালো হলনা, পায়ের পেশীতে ভালোরকম টান লেগেছে, হাঁটতে বেগ পেতে হচ্ছে। চিন্তিত হলেও জয়ন্তদা জোর দিল, জেদ চেপে গেল, আমি পারবই, পৌঁছতে আমাকে হবেই। ছোট ছোট দূরত্বে লক্ষ্য ঠিক করে ধীরে এগোতে লাগলাম। রাস্তা একইভাবে অসংখ্য বাঁক নিয়ে ক্রমশ উচ্চতা বাড়িয়ে চলেছে, কোথাও সংকীর্ণ কোথাও অল্প প্রশস্ত। উচ্চতার সঙ্গে গাছগাছালি, পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন ও অতুলনীয় নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে এসে থামলাম 'সোকা (Tshoka),' এই পথের শেষ গ্রাম। যেন শিল্পীর আঁকা ছবি, অতীব সুন্দর এই গ্রাম। হাঁটাপথের দুইপাশে কয়েকটি ছোটো বাড়ি, একটি হাট, গ্রামের প্রায় শেষে কিছুটা ওপরে একটি জলাশয় ও তার পাশে একটি বৌদ্ধ মনাস্ট্রি। এখানকার ট্রেকার্স হাটটি বেশ সুন্দর, সামনে তাঁবু লাগানোর মত বেশ অনেকখানি জায়গা রয়েছে। অনেক অভিযাত্রীই এখানে রাত্রিবাস করেন।

অবশেষে বিকেল নাগাদ পৌঁছলাম 'ফেডাং।' চাতাল মত একটি জায়গা, বেশ উন্মুক্ত. মাঝ বরাবর হাঁটা রাস্তাটি চলে গেছে, রাস্তার পাশে একটি হাট, এই হল ফেডাং। পোর্টার বন্ধুরা আমাদের রান্নার সামগ্রী আগেই এখানে হাটে রেখে গেছে। জোংরির অভিমুখে তাকিয়ে দাঁড়ালে আরেকটি অস্পষ্ট হাঁটা পথ ডানদিকে চলে গেছে দেখা যায়, এই পথটি গোয়েচা-লা থেকে ফেরার পথে অভিযাত্রীরা ব্যবহার করে থাকেন, তাতে ফেরার সময় পথ কিছুটা কম হয়। এখানে হাটটি শক্তপোক্ত, তবে বেশ নোংরা, খুব একটা ব্যবহার হয়না মনে হয়। গত কয়েকদিনের বৃষ্টির কারণে হাটের সামনের জায়গাটি কাদা ভর্তি, বাধ্য হয়েই হাট থেকে একটু দূরে আমাদের তাঁবু ফেলা হল। চারপাশ ঘন কুয়াশায় মোড়া, ঠান্ডাও বেশ ভালোই। খানিক গল্প আড্ডা সেরে ফের রাত্রের খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে লেগে পড়লাম আমরা, আমিও এখন অনেকটাই সুস্থ বোধ করছি। ইতিমধ্যে এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা হল।

এক পোর্টার বন্ধু হাট-এ এসে থামল, পিঠ ভর্তি মাল, আজই সে ইয়াকসাম থেকে রওনা দিয়েছে, গন্তব্য জোংরি, জঙ্গলপথে রাত হয়ে গেলেও তাকে পৌঁছতেই হবে। পাহাড়ে জীবনসংগ্রাম কতটা কঠিন এই ছোট্ট ঘটনা থেকে আবারও অনুভব করলাম। খানিক জিরিয়ে নিয়ে ও চা-বিস্কুট খেয়ে সে আবার এগিয়ে গেল, একটা জলের বোতল ও কিছু হালকা খাবার আমরা তার সঙ্গে দিয়ে দিলাম। প্রার্থনা করি সে যেন সুস্থ ভাবে পৌঁছে গিয়ে থাকে।

রাতের খাওয়া সেরে সবে স্লিপিং ব্যাগের উষ্ণতায় আত্মসমর্পণ করেছি, হঠাৎ বাইরে থেকে ডাক, "সাবজি, আপকা টেন্ট মে জাগা হোগা?"

ভোরের কুয়াশামোড়া ফেডাং

আমাদের গাইড ভাই ডাকছে। সে ওই হাটে শুয়েছিল, কিন্তু ভয়ে অবশেষে আমাদের কাছে ছুটে এসেছে, এখানে নাকি ভূতুড়ে ব্যাপার আছে। শুনে বেশ মজাই পেলাম। এখানে বলে রাখা ভাল পাহাড়ি মানুষজনের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস বেশ প্রবল। নিস্তব্ধ অন্ধকারে পাহাড়ি জঙ্গলের মধ্যে রাতে ঘুমোনোর আগে ভূতের গল্প শুনতে বেশ লাগছিল। তবে সেই গল্পের কারণেই কিনা জানিনা, শিরশিরানি ঠান্ডায় ওই পরিবেশে মধ্যরাতে প্রকৃতির ডাকে সারা দিতে বেরিয়ে গা ছমছমে ব্যাপারটা বেশ ভালোই অনুভব করেছিলাম।

তৃতীয় দিন পেলাম অসাধারণ এক ঝকঝকে সকাল। সুদূরে তুষারাবৃত পান্ডিম-এর শিখর দিনের প্রথম আলোয় রক্তরাঙা দেখাচ্ছিল। নীচ থেকে উঠে আসা মেঘের সঙ্গে সূর্যরশ্মি যেন লুকোচুরি খেলা শুরু করেছে। আমাদের ক্যামেরাগুলোর ব্যস্ততা ছিল চোখে পড়ার মত। সকালের খাবার খেয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম, ইতিমধ্যে পোর্টার ভাইরাও এসে পড়েছে। তবে আজ মিলনদা একটু ঝিমিয়ে আছে, গতরাত থেকে জল কম খাওয়ার কারণে উচ্চতাজনিত সমস্যা মনে হচ্ছে। ব্যাগপত্র গুছিয়ে হাঁটা শুরু করলাম, আজ পথ তুলনামূলক সহজ। মিলনদাকে বলা হল ধীরে সুস্থে হাঁটতে।

সামনে রাস্তা বেশ মনোরম, চড়াই কম, সঙ্গে উতরাইও রয়েছে আজ, কিছু জায়গায় পথ বাঁশ দিয়ে বাঁধানো, কিন্তু ভেঙ্গে গিয়ে ও বৃষ্টির জন্যে বেশ পিচ্ছিল হয়ে আছে। পথিমধ্যে মাঝেমধ্যেই চোখে পড়ে গলায় ঝোলানো ঘন্টায় আওয়াজ তুলে পোর্টার বন্ধুর তত্ত্বাবধানে ইয়াক আর ঘোড়ার দলের মাল নিয়ে চলাচল। উঁচু জঙ্গল শেষ হয়ে আজ বেশ উন্মুক্ত চারপাশ। বিভিন্ন রকম নাম না জানা ফুল ও পাখির আওয়াজে মন ফুরফুরে হয়ে যায়। আর রয়েছে রডোডেনড্রন। নানারকম রং ও চেহারার রডোডেনড্রন ফুলে চারপাশ ছেয়ে আছে। মানসচক্ষে না দেখলে শব্দে এই সুন্দরী হিমালয়ের সৌন্দর্যকে বাঁধা যাবেনা। অবশেষে অভিযানের শেষ, 'জোংরি' পৌছলাম সকাল এগারোটা নাগাদ।

তাঁবু লাগিয়ে পিঠের ভারী রুকস্যাক নামিয়ে একটু নিশ্চুপ অপেক্ষা, না ক্লান্তি নয়, নির্মল প্রকৃতিকে আরও কাছে টেনে নেওয়ার চেষ্টা, হিমালয়ের কোলে আবারও ফিরে আসার আনন্দকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করে নেওয়া। তবে এর মধ্যেই দুঃসংবাদ, মিলনদা বেশ অসুস্থ। শরীরে জল কম, মাথা ঘুরছে। গাইড ভাই রসুনের রস বানিয়ে এনে দিল, স্থানীয় ওষুধ। জয়ন্তদা মিলনদার সঙ্গে থেকে গেল, আমরা একটু বেরোলাম চারপাশটা ঘুরে নিতে।

রডোডেনড্রনে ছাওয়া জোংরি ভ্যালি

বেশ খানিকটা প্রশস্ত জায়গা জুড়ে জোংরি। একটা পুরনো হাট রয়েছে, নতুন আরেকটি হয়েছে, তার পাশেই একটা বেশ বড় ঘর রয়েছে যেখানে টুকটাক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাওয়া যায়, গাইড ও পোর্টার ভাইদের রান্না করা থাকারও জায়গা সেটি। উচ্চতার কারণে চারপাশ উন্মুক্ত, বড় গাছের জঙ্গল আর নেই। ওপরের দিকে রাস্তা এগিয়ে গেছে জোংরি টপ-এর দিকে, জোংরির উচ্চতম জায়গা। গোয়েচা লা-র পথে এখানে একটা অতিরিক্ত দিন কাটিয়ে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেন অভিযাত্রীরা। জোংরি টপ যাওয়ার পথে কিছুটা গিয়ে রাস্তা নীচের দিক হয়ে চলে গেছে গোয়েচা লা-র দিকে। আমরা ইতিউতি চারপাশটা একটু ঘুরে নিলাম, ক্যামেরা বন্দী করলাম অসংখ্য স্মৃতি।

যেকোনও অভিযানের একটি বড় আকর্ষণ প্রাকৃতিক পরিবেশে রাতের নিস্তব্ধ অন্ধকারে টর্চের আলোয় একসঙ্গে রান্না করা। দিনের শেষে যেন আস্ত আড্ডাখানাতে পরিণত হয় রান্নার তাঁবুটা। পরদিন খুব ভোরে জোংরি টপের উদ্দেশে বেরোনো স্থির হল, গাইড ভাইয়ের সঙ্গে আমি, সুমিতদা ও অনিমেষ। জয়ন্তদা আগেও বেশ কয়েকবার এসেছে বলে মিলনদার সঙ্গে থাকবে বলে ঠিক করল। সকালে অসাধারণ সূর্যোদয় দেখার আশা নিয়ে হাড়কাঁপানো ঠান্ডার মধ্যে অবশেষে ঘুমের দেশে পাড়ি দিলাম।

চতুর্থ দিন আলো উঠতে তখনও ঢের দেরি, "ভাই ওঠ, আড়াইটে বেজে গেছে," পাশের তাঁবু থেকে সুমিতদার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। স্লিপিং ব্যাগের উষ্ণ আলিঙ্গন ছেড়ে বেরিয়ে এসে প্রস্তুত হলাম, কনকনে ঠান্ডার মধ্যে তিনটে নাগাদ হাঁটা শুরু করলাম আমরা তিনজন, সঙ্গে গাইড ভাই। আকাশভর্তি ঝলমল করছে একগুচ্ছ তারা, যেন তাদের অল্প আলো দিয়েই আমাদের পথ দেখানোর চেষ্টা করছে। হেড টর্চের আলোয় ভরসা করে ও আমাদের গাইড ভাইকে অনুসরণ করে সরু পথ ধরে প্রায় এক ঘন্টা পর পৌঁছলাম প্রায় ৪১৭১ মিটার উচ্চতায় জোংরি টপ - স্থানীয় ভাষায় "ডাবলাহাগাং।" আলো ফুটতে তখনও ঢের দেরি।

পুরো শরীর কাঁপছে, ঠান্ডায়, আনন্দে। উচ্চতা সামান্য হলেও গত কয়েকমাসের অসুস্থতার ধকলের পর এটাই এভারেস্টসম, যখন সামান্য

নড়াচড়া করাও চরম কষ্টসাধ্য ছিল, তখন পাহাড়ে আবারও আসতে পারা ছিল কল্পনাতীত। কিন্তু সম্ভব হয়েছে অবশেষে। এসব আকাশকুসুম ভাবতে ভাবতেই চোখে পড়ল দূর দিগন্তে মৃদু আলোর আভা। চোখের কোণটা একটু আর্দ্র ঠেকল।

ডাবলাহাগাং - জোংরি টপ

দেখতে দেখতে দিগন্ত স্পষ্ট হল। সূর্যের প্রথম আলোয় রক্তরাঙা পর্বতশৃঙ্গগুলির নৈসর্গিক দৃশ্য। মিঠে রোদ্দুর ভাসিয়ে দিল চারপাশ, সেই উষ্ণতা গায়ে মেখে আমরাও যেন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলাম। পতপত করে উড়ে চলেছে বৌদ্ধ প্রার্থনার পতাকাগুলি। দূরে নীচে উপত্যকায় চোখে পড়ল একপাল ভেড়া চরছে।

পাহাড়ের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ও অনেক স্মৃতি ক্যামেরাবন্দী করে এবার ফেরার পালা, রেখে যাওয়া আবারও ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি। জোংরিতে তাঁবুর কাছে ফিরে এসে আরও একটি অবাক হওয়া বাকি ছিল। তাঁবুতে ঢুকতে গিয়ে দেখি তাঁবুর ওপরে শিশির বিন্দুগুলি জমে বরফ হয়েগেছে।

উতরাই পথে আজ একেবারে বাখিম অবধি নেমে যাব আমরা। প্রাতঃরাশ করে ও দুপুরের খাবার প্যাকেটবন্দী করে, তাঁবু ইত্যাদি গুছিয়ে নিয়ে প্রস্তুত হলাম দীর্ঘ যাত্রার উদ্দেশ্যে। একই পথে আবার নেমে আসা, তবে আজ শরীর মন অদ্ভুত শান্ত, তৃপ্ত। নেমে আসতেই মিলনদাও সুস্থ অনুভব করতে লাগল ও তরতাজা হয়ে উঠল।

অবশেষে বেলাশেষে পৌছলাম বাখিম। তাঁবু লাগিয়ে নিয়ে বাখিমের সেই হাটের বারান্দায় শুরু হলো চা-আড্ডা। পাহাড়ের কোলে এবারের মত এই শেষ রাত। অফুরন্ত গল্পের স্রোতকে বাঁধ দিয়ে অবশেষে রান্না-খাওয়া সেরে উঠতে আজ বেশ ভালোই রাত হল। আজ ট্রেকের পঞ্চম দিন - খানিকটা অবসাদঘেরা, এবার যে বিদায়ের পালা। যদিও সেই বিদায়যাত্রাকে স্মরণীয় করার দায়িত্ব নিয়েছিল দুটি সারমেয়। বাখিম থেকে ইয়াকসাম পুরো পথ তারা আমাদের সাথী হল - আমরা একসাথে নামলাম, বিশ্রাম নিলাম, জলখাবার খেলাম। পথিমধ্যে দেখা হল হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট-এর একটি শিক্ষার্থী দলের সঙ্গে, তারা চলেছে বাখিমের উদ্দেশ্যে।

দুপুরের মধ্যেই ইয়াকসাম পৌঁছে সেই আগের হোটেলেই ঘর নিলাম। বিকেলে ইতিউতি ঘোরাফেরা ও আগামীকালের জন্যে গাড়ি বুক করা হল। আজ রাতে বড়া খানা, সফল ট্রেক-এর উদযাপন। মিলনদা মাংসটা খাসা রেঁধেছিল সে রাতে।

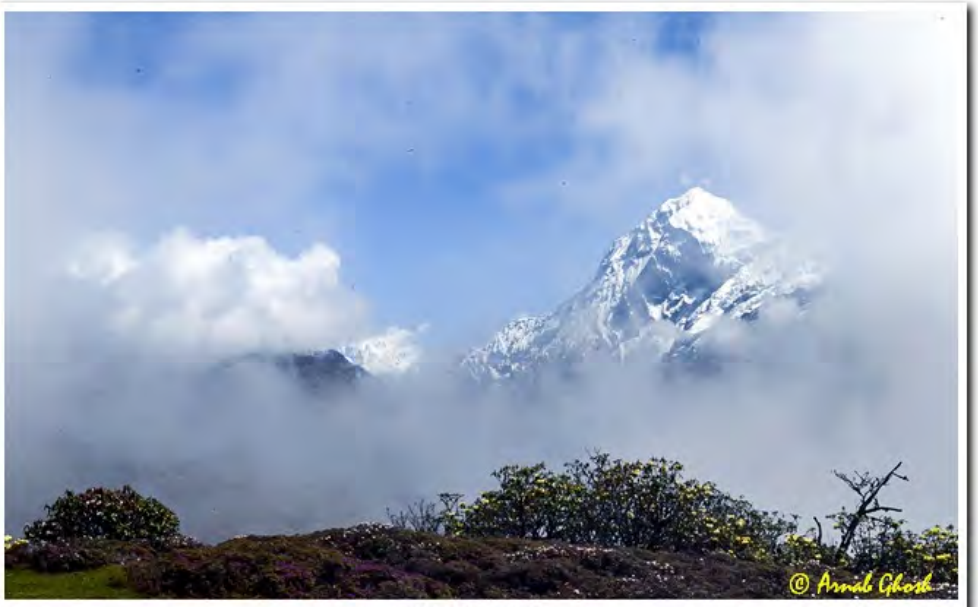

পথে যেতে যেতে

জোংরি-গোয়েচা লা ট্রেক রুট ম্যাপ // *জোংরি ট্রেকের আরো ছবি*

জীবনকে দেখা-জানা-শেখার জন্য বেড়ানোই হল সবচেয়ে বাস্তব উপায় – মনে করেন অর্ণব ঘোষ। ভালোবাসেন পাহাড়, প্রকৃতি, গাছপালা আর প্রাণীকূল - তাদের ক্যামেরায় ধরে রাখতেও। "মাউন্টেন কোয়েস্ট ক্যালকাটা" ক্লাবে যোগ দেওয়ার পর নিজের মনের ট্রেকিং করার সুপ্ত ইচ্ছে আবার চাগাড় দিয়ে উঠেছে। সময় পেলেই পাহাড়ে চলে যান। হিমালয় হলে তো কথাই নেই, একান্ত না হলে পুরুলিয়া কিংবা বাঁকুড়াই সই।

---

tell a Friend

রাঁচিগমনঃ

তপন পাল

~ রাঁচির আরও ছবি ~

ভূমিকাঃ বেডরুম বা বোর্ড রুমের কথা বাইরে আলোচিত না হওয়াটাই শোভনতা; তবে তোমরা তো আমার ঘরের লোক, তোমাদের বলতে অসুবিধা নেই। একদিন, বা ঠিক করে বলতে গেলে একরাতে, শ্রীমতী পাল আমাকে বললেন তিনি একবার হাজারিবাগ যেতে চান। শুনে আমি আশ্চর্য হলাম; হাজারটি বাঘ বা হাজারটি বাগান, যে অর্থেই শহরটি তার নাম অর্জন করে থাকুক না কেন, বাঘ বা বাগানের সঙ্গে আমাদের খুব একটা সম্প্রীতি নেই। আমরা খুঁজি সমুদ্র, নদী, নিদেন পক্ষে নালা খাল বিল পুকুর...। হাজারিবাগে তো যতদূর জানি কোন বড় নদীও নেই। দামোদরের এক শীর্ণ শাখানদী কোনার শহরটির পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে; অন্তত এমনটিই দেখেছি রেলগাড়িতে যেতে যেতে।

তাহলে হাজারিবাগ কেন? শ্রীমতী পাল বললেন আজ নয়, সেই ১৯৮৭ থেকেই তার হাজারিবাগ যাওয়ার শখ। তখন আমার আস্তে আস্তে মনে পড়ল। ১৯৮৭তে আমরা থাকতাম বহরমপুরে, জাতীয় সড়ক সন্নিহিত এক সরকারি আবাসনে। সেখানে আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, জনৈক পরিবহণ আধিকারিক, মহাসমারোহে হাজারিবাগ গিয়েছিলেন রাজারাপ্পার ছিন্নমস্তিকা মন্দিরে পুজো দিতে। তিনি আমাদেরও তাঁর সঙ্গে যাওয়ার অনুরোধ করেছিলেন; কিন্তু তখন পুত্রটি নেহাতই ছোট; তাই আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি। কে জানতো যে সেই না যেতে পারার অতৃপ্তি তিনি লালন করেছেন এতদিন! খোঁজ খবর শুরু হল। জানা গেল রাজারাপ্পা হাজারিবাগ ও রাঁচি, উভয় শহর থেকেই সহজগম্য। তদনুযায়ী গন্তব্য ঠিক হল রাঁচি।

বিকেলবেলার দিকে মধ্যেমধ্যে চা খেতে আমি বাবুঘাটের দিকে যাই। তখন দেখেছি রাঁচির বাস ছাড়ে মুহুর্মুহু। তবে কি বাসেই যাব? শেষ অবধি যাওয়া ঠিক হল ১৮৬১৫ হাওড়া-হাতিয়া ক্রিয়াযোগ এক্সপ্রেসে। ইনি হাওড়া ছাড়েন রাতের বেলা, দশটা দশে। খড়গপুর-টাটানগর-চান্ডিল-মুড়ি হয়ে রাঁচি পৌঁছান পরদিন সকাল সাতটায়। ঠিক হল চারটে দিন থাকা হবে, তার মধ্যে দুদিন বেরোনো হবে, একদিন রাজারাপ্পা আর একদিন ম্যাকলুস্কিগঞ্জ। ফেরা ওই ১৮৬১৬ হাতিয়া-হাওড়া ক্রিয়াযোগ এক্সপ্রেসেই। ইনি রাঁচি ছাড়েন রাত সাড়ে নটায়, হাওড়া পৌঁছান পরদিন সকাল সাড়ে ছটায়।

তদনুযায়ী হাওড়া স্টেশনের নতুন ঘাঁটি। আমাদের রেলগাড়ি ২২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দন্ডায়মানা। তিনি অতি দীর্ঘ, দুটি এস এল আর, তিনটি অসংরক্ষিত, এগারোটি স্লিপার, চারটি বাতানূকুলিত তিন ধাপের, দুটি বাতানূকুলিত দুই ধাপের ও বাতানূকুলিত প্রথম শ্রেণীর মিশ্র কামরা নিয়ে তিনি তেইশ কামরার। আমাদের জায়গা HA 2 কামরায়। সেখানে গিয়ে দেখা গেল সত্তরোর্ধ দুই ভগিনী আমাদের বরাদ্দ দুটি লোয়ার বার্থে শয়ান। উঠুন ঠাকমা, এটা আপনাদের নয়, ইত্যাদি বলাকওয়ার পর জানা গেল তারা একটি সুবৃহৎ বাঙালিসুলভ ভ্রমণার্থীদলের অংশবিশেষ, এবং তাঁদের টিকিট বাতানুকুলিত তিন ধাপের কামরায়। এরপর মোটামুটি ঘটনাবিহীন ভাবেই চারবার সুবর্ণরেখা পেরিয়ে পরদিন সকালে রাঁচি। সকালবেলার দিকে জানলা দিয়ে দেখা গেল ঘন সবুজে ঢাকা টিলা ছড়িয়ে রয়েছে দিগন্ত জুড়ে, আকাশ রাঙিয়ে সূর্য উঠছে। সূর্যওঠা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র আদিখ্যেতা নেই, আমি অতি ভোরে উঠি, রোজই সূর্যোদয় দেখি। চায়ের চিন্তায় মগ্ন হলাম।

প্রথম দিনঃ

জঙ্গল, টিলা আর আদিবাসী জনজাতি অধ্যুষিত ছোটনাগপুর মালভুমির দক্ষিণ দিকে জলের উৎস রাঁচি লেককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে রাঁচি শহর, "দ্য সিটি অফ ওয়াটার ফলস্", বর্তমানে ঝাড়খন্ডের রাজধানী। ছোটনাগপুর মালভূমির অরণ্য আচ্ছাদিত রাঁচি "ছোটনাগপুরের রাণী" বলে অভিহিত। এই রাজ্যের রয়েছে এক সমৃদ্ধ ইতিহাস। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এই অঞ্চল। বিরসা মুন্ডার বীরত্বপূর্ণ কিংবদন্তী এখনও প্রতিটি মানুষের স্মৃতিতে জাগরূক।

হোটেল কর্তৃপক্ষ সদাশয়, তিনদিনের জন্য একটি গাড়ির বন্দোবস্ত তাঁরা আগে থেকেই করে রেখেছিলেন। তিনি এলেন নটায়। ততক্ষণে আমরাও প্রস্তুত। বাড়িতে বিউলি ডাল আলুভাতে দিয়ে ভাত খেলেও বেড়াতে বেরোলে আমরা কিঞ্চিৎ সাহেবভাবাপন্ন হয়ে পড়ি, বিশেষত প্রাতরাশের বিষয়ে। লুচি তরকারি, পুরি সব্জি, পরটা ঘুগনি শুনলেই বিরক্ত লাগে। ম্যাগো! ওইসব খাও আর সারাদিন আইঢাই কর আর ঢ্যাক ঢ্যাক করে ঢেকুর তোল। ঢের ভাল আমার মাখন-জেলিবিহীন শুকনো পাউরুটি।

প্রথমেই রাঁচি লেক। শহরের বুক জুড়ে ২১৪০ ফুট উঁচু রাঁচি পাহাড়ের পাদদেশে তার বিস্তৃত বিস্তার। ১৮৪২ সালে কলোনেল অস্লে এই হ্রদের পত্তন করেন। রাঁচি পাহাড়ে উঠলে নাকি খুব সুন্দর নিসর্গদর্শন হয়, কিন্তু আমাদের পায়ে অত জোর নেই। তারপর টেগোর হিল। কাদম্বরী দেবীর স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৯০৮ সালে কলকাতা ছেড়ে মোরাবাদি পাহাড়ে বাড়ি তৈরি করে বসবাস শুরু করেন। ১৯২৫ সালের ৪ মার্চ এখানেই তাঁর মৃত্যু। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুষঙ্গেই পাহাড়টি ক্রমশ লোকমুখে টেগোর হিল হিসেবে পরিচিতি পায়। তিনি তৈরি করেন 'শান্তিধাম', উপাসনার জন্য পাহাড় চূড়ায় ব্রহ্মমন্দির। একটি কুসুম গাছের নীচে রয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তৈরি একটি বসার বেদি 'কুসুমতল'। বড়লোকের খেয়াল বলে কথা, পিতার অর্থ থাকিলে কত কী-ই না করা যায়। এখন তার সর্বাঙ্গে উপেক্ষা, অবহেলা, মালিন্যের ছাপ। দেখলে মন খারাপ হওয়ার বদলে গা রি রি করে, কী বিপুল অপব্যয়। তৎকালীন ভূমিনির্ভর বাবুয়ানির অর্থের উৎস কোথায়, কাদের গলা টিপে, সেটি আমাদের না জানার কথা নয়। সেখান থেকে নক্ষত্র বন। ২০০৩ সালে রাজভবনের বিপরীতে তৈরি বাগিচাটি রাশিচক্র অনুসারে সাজানো। তারপর রক গার্ডেন, আর তার নীচে শহরে জলের যোগানদার কাঁকে বাঁধ। রক গার্ডেনটি অতি মনোহর, বিশেষত হাতে সময় থাকলে। গাছ, ঝরনা, কৃত্রিম মানুষপ্রমাণ গুহা যার ভিতরে ঢুকে বসে থাকলে বিশ্বজাহান তোমাকে খুঁজে পাবে না। আহারে, চল্লিশ বছর আগে যদি আসতে পারতাম! সেখান থেকে দশম জলপ্রপাত; দুই ধাপে ৪৪ মিটার নীচে আছড়ে পড়ছে কাঞ্চি নদী; অরণ্যানী, পাহাড়, পাথর। কিন্তু সূর্যোদয় দেখতে হলে যেমন ভোরবেলায় উঠতে হয়, তেমনিই জলপ্রপাত দেখতে হলে বিস্তর সিঁড়ি ভাঙতে হয়। তাই দূর থেকেই।

পরবর্তী গন্তব্য শহরের প্রান্তে, ছোট টিলার উপর নির্মিত জগন্নাথ মন্দির। ১৬৯১-এ বড়কাগড়ের রাজা ঠাকুর অনীশনাথ সহদেও পুরীর মন্দিরের আদলে এটি নির্মাণ করান। ১৯৯০-এ সেই মন্দির ভেঙে যাওয়ার পর নতুন মন্দির হয়েছে ১৯৯২-এ। রথযাত্রার সময় বড় মেলা বসে। অনেকখানি হাঁটতে হল, গাড়ি রাখার নিয়ম টিলার নিচে। কেন যে এরা রোপওয়ে করে না! তারপর নবনির্মিত সূর্যমন্দির; টাটানগরের রাস্তায় পাহাড়ের মাথায় বিশাল রথের আকারের মন্দির - সম্মুখ ভাগে সাতটি পাথরের ঘোড়া। এবং মধ্যাহ্নভোজ।

সেখান থেকে দেউড়ি মন্দির; টাটা রাঁচি হাইওয়ের (জাতীয় সড়ক ৩৩) ওপর রাঁচি থেকে অনেকদূরে ষোড়শভূজা দেবী দুর্গার অতিবিস্তৃত অতি পুরাতন মন্দির। পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে, মধ্যিখানে সিমেন্টের মত কিছু না দিয়েই গাঁথনি। মন্দিরের পুরোহিতদের মধ্যে কয়েকজন আদিবাসী, বাইরে আদিবাসীদের একটি দল ধামসা মাদল বাজাচ্ছেন। একদা অখ্যাত এই পুরাতন মন্দিরটি অধুনা বহুখ্যাত, কারন মহেন্দ্র সিং ধোনি খেলতে যাওয়ার আগে এখানে পূজা দিয়ে যেতেন, তাই থেকে জনবিশ্বাসে মান্যতা পেয়েছে এই দেবীর প্রসাদেই ধোনির খ্যাতি। মৌখিক ইতিহাস বলে আজ অবধি যারা এই মন্দিরের মূল কাঠামোর পরিবর্তন করতে গিয়েছেন তাঁদের সবার জীবনেই নেমে এসেছে বিপর্যয়। তাই এখন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মন্দিরের মূল কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে মন্দির বড় করার। কংক্রিটের মস্ত মস্ত থাম উঠছে আকাশছোঁয়া - আর সেই কাজে ভক্তজনদের কাছ থেকে টাকা চাওয়া হচ্ছে। দেখে খারাপ লাগে, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন হয় আমরা জানি, কিন্তু ধোনি তো সত্যিই ধনী। তাঁর প্রিয় মন্দিরের 'উন্নতিকল্পে' জনগণের কাছ থেকে টাকা তুলতে হবে! দু পাঁচ দশ কোটি টাকা তো তাঁর কাছে নস্যি!!
সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন।

দ্বিতীয় দিনঃ

বাল্যকালে শ্যামনগরস্থিত ভারতচন্দ্র পাঠাগারের শিশু ও কিশোর বিভাগের সদস্য ছিলাম। ওই পাঠাগারের নামে সন্দেশ পত্রিকার গ্রাহকপদ ছিল। সেই গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখ করে পাঠাগারের শিশু ও কিশোর বিভাগের অনেক সদস্যই পত্রিকার নানাবিধ প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানে অংশ নিত। পরবর্তীকালে আমার পুত্রও সন্দেশের গ্রাহক হয়েছিলো। সেই সূত্রে লীলা মজুমদারের সঙ্গে বারকয়েক সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতা হয়েছিল। স্নেহশীলা, মাতৃসমা (আমি বলতাম পিসিমা) মানুষটির কাছে রাজরাপ্পা ভ্রমণের গপ্পো শুনেছি, সেখানে যেতে হলেই নাকি পথিমধ্যে গাড়ি বিগড়াত। এখন যোগাযোগ অনেক উন্নত, ৩৩ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে হাজারিবাগ থেকে ৪৮ কিমি আর রাঁচি থেকে ৪৩ কিমি, অর্থাৎ হাজারিবাগ-রাঁচির মাঝপথে রামগড় থেকে আরও ৩২ কিমি গিয়ে রাজরাপ্পা জলপ্রপাত। পুরুষ দামোদরের বুকে নারী ভৈরবীর ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃশ্য উসকে তোলে ছিন্নমস্তার বেদিমূলে বিপরীত বিহাররত কাম ও রতির, প্রাণতোষিণী তন্ত্র গ্রন্থে বর্ণিত দেবী ছিন্নমস্তার উদ্ভবের চিত্রকল্প। সেখানে এক টিলার উপরে এই মন্দির। ভৈরবী নদীর হাঁটু জল পেরিয়ে মন্দিরে যেতে হত, এখন বাঁশের সাঁকো হয়েছে। ক, রক্তবর্ণা বর্ণনী রজোগুণের। ছিন্নমস্তা বিপরীত বিহাররত কাম ও রতির দেহের উপর যুদ্ধভঙ্গিমায় দণ্ডায়মানা, বাৎসল্যরস যে কামনার চেয়ে দৃঢ়, সেই জীবনবোধের তিনি উদ্গাতা। ছিন্নমস্তা আত্মবলিদান, সংযম ও সৃষ্টিশক্তির প্রতীক; তিনি একাধারে পুষ্টি তথা জীবনদাত্রী, অপরদিকে জীবনহন্তারক। দুর্গাষ্টমী মহানবমীর সন্ধিক্ষণে দেবী দুর্গার যে সন্ধিপূজা হয়, তা রূপভেদে এই দেবীরই পূজা।
হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে ছিন্নমস্তার পূজা প্রচলিত। তিব্বতী বৌদ্ধ দেবী বজ্রযোগিনীর ছিন্নমুণ্ডা রূপটির সঙ্গে দেবী ছিন্নমস্তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। শাক্ত মহাভাগবত পুরাণগ্রন্থ অনুসারে দক্ষের কন্যা দাক্ষায়ণী ছিলেন শিবের প্রথমা স্ত্রী। দক্ষ তাঁর যজ্ঞানুষ্ঠানে শিবকে নিমন্ত্রণ না জানালে দাক্ষায়ণী বিনা আমন্ত্রণেই পিতার যজ্ঞে যেতে মনস্থ করেন। কিন্তু শিব রাজি হন না। তখন দাক্ষায়ণী ভীষণা দশমূর্তি ধারণ করে দশ দিক থেকে শিবকে ঘিরে

ধরেন। শিব আতঙ্কিত হয়ে অনুমতি প্রদান করেন। এই দশ মূর্তিই দশমহাবিদ্যা - এদের মধ্যে ছিন্নমস্তা স্বয়ং পার্বতী, মতান্তরে পরশুরাম জননী রেণুকা; ইনি রাহুগ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। প্রাণতোষিণী তন্ত্র গ্রন্থে দেবী ছিন্নমস্তার উদ্ভবের অপর একটি আখ্যান বিবৃত, কিঞ্চিৎ আঁশটে গন্ধ থাকায় সেটি এখানে আলোচিত না হওয়াই সমীচীন। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী কৃষ্ণাচার্যের শিষ্যা ছিলেন মহাসিদ্ধা দুই বোন মেখলা ও কনখলা। তাঁরা তাঁরা নিজেদের মাথা কেটে গুরুকে উপহার দেন এবং তারপর নৃত্য করেন। দেবী বজ্রযোগিনী সেই রূপেই সেখানে উপস্থিত হন এবং তাঁদের সঙ্গে নৃত্যে যোগ দেন।

বিপুল লম্বা লাইন। ঘণ্টাদেড়েক দাঁড়াবার পর দর্শন মিলল। পুণ্যার্থীদের অনেকের হাতে দড়িবাঁধা ছাগল, চকচকে তেলমাখা দেহ, ভারী করুণ আতঙ্কিত চোখ। দর্শনের পর মন্দির চাতাল থেকে যেপথ দিয়ে নেমে বাইরের দিকে গেলাম, তার ঠিক পাশে রক্তাক্ত বলিক্ষেত্র। দেখলে পিলে চমকে যায়!। বিপুল সংখ্যায় বলি হয়, কসাইরা যন্ত্রের মত বলি দিয়ে চলে, নর্দমা দিয়ে রক্তস্রোত দামোদরে মেশে, পুণ্যার্থীদের পায়ে পায়ে চটচটে রক্ত প্রাঙ্গণে ছড়ায়। বলির পর স্পন্দমান ধড়টিকে কসাই যে কী অবহেলায়, তাচ্ছিল্যে, সম্ভবত ঘৃণায়ও, ছুঁড়ে ফেলে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। অ্যানাটমির এক প্রবাদপ্রতিম শিক্ষককে একবার ছাত্রদের বলতে শুনেছিলাম - Respect the Dead। ছাত্রটি এক হাতে একটি মনুষ্যঅস্থি ধরে অন্য হাতে সিগারেট খাচ্ছিল। সেই কথাটি মনে পড়ছিল বার বার।

আমি পশুহত্যার বিপক্ষে নই। পঞ্চান্ন বছর বয়স অবধি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মেরই নিষিদ্ধ মাংস পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে এসেছি। কিন্তু দেবীমাতার নামে পশুহত্যা, তাও এমন এক দেবীর নামে যিনি বাৎসল্যের প্রতীক; কেমন যেন লাগে। দর্শনার্থীদের সারিতে আমাদের সম্মুখেই ছিলেন নদীয়া জেলার এক প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক। বিবাহের ষোড়শ বৎসর পরে তাঁর সন্তানলাভ হয়েছে, তাই তিনি, তার নিজের ভাষাতেই, মার্কিনদের মত থ্যাঙ্কসগিভিং-এ দেবীমাতার কাছে এসেছেন। কিন্তু হাতের দুটি দড়িবাঁধা ছাগল দেখে থ্যাঙ্কসগিভিং হ্যালোউইন-এ পর্যবসিত হল। আমার সন্তানলাভ হয়েছে বলে ছাগীমাতাকে যদি সন্তানহারা হতে হয়, সেই যুক্তিতে তো অনেক কিছুই সমর্থনীয় হয়ে ওঠে। পাথরের সিঁড়ির উঁচু চওড়া ধাপ এসে শেষ হয়েছে মোহনায় - ভেরা আর দামোদর নদের সঙ্গম, খুব পবিত্র। নামতে গিয়ে দেখি জায়গায় জায়গায় টাটকা রক্ত, নদীর স্রোতেও মিশে যাচ্ছে। ওখানেই জেগে-থাকা পাথরে বসে স্নান করছেন পুণ্যার্থীরা। মাথার উপরে চিল শকুনের ওড়াওড়ি। পারিপার্শ্বিকে খুব একটা ভক্তি জাগে না। কালীঘাট মন্দিরে গেলেও আমি যাই ভোর পাঁচটায়, বলি শুরু হওয়ার আগে। পায়ে চিটচিটে রক্ত লাগলে খুব বিরক্ত লাগে।

মধ্যাহ্নভোজ। ফেরার পথে হুড্রু জলপ্রপাত। উচ্ছল সুবর্ণরেখা বিরামহীন শব্দে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পাথরে। তারপর জোনা বা গৌতমধারা জলপ্রপাত। পাহাড়ের কোল বেয়ে, আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে থাকা পাথর এড়িয়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে নীচে এসে পড়ছে ঝরনার জল। তারপর চলে যাচ্ছে রাঢু নদীতে। সব শেষে সীতা জলপ্রপাত।

তৃতীয় দিনঃ

ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ {Mccluskiegunj (MGME)} তথা ছোটা ইংল্যান্ডে যাওয়ার ইচ্ছাটি আমার আবাল্য। কিন্তু ওই আর কী, যাওয়া হয়ে ওঠেনি পাকেচক্রে; এবং তার জন্য রেল কোম্পানিও কিঞ্চিৎ দায়ী। হাওড়া থেকে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ যাওয়ার সরাসরি রেলগাড়ি একটিই, ১১৪৪৮ হাওড়া-জবলপুর শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস। ইনি হাওড়া ছাড়েন দুপুর একটায়, ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ পৌঁছন রাত এগারোটায়। রাত এগারোটা বরকাকানা জংশন বারওয়াদি জংশন শাখার এই ছোট রেল স্টেশনটির কাছে গহিন নিশুতি রাত। স্টেশনটির প্ল্যাটফর্মগুলি গ্রাউন্ড লেভেল; এবং ফুট ওভারব্রিজ নেই। ট্রেন থেকে নেমে রেললাইন পেরোতে হবে, সেখানে সর্বদা কয়লাভর্তি মালগাড়ির আসা যাওয়া। তারপরে অঞ্চলটির ভূ-রাজনীতিও খুব ভ্রমণার্থীবান্ধব নয়; নচেৎ ঔপনিবেশিক রেলব্যবস্থার মহান এই কেন্দ্রটিতে অনেক আগেই আসা যেত। সম্প্রতি কোঙ্কণা সেনশর্মার A Death In The Gunj সিনেমাটি দেখে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ যাওয়ার সুপ্ত ইচ্ছাটি জেগে উঠেছিল।

ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তঃপাতী অরণ্য টিলা নদী জনবসতি সংবলিত দৃষ্টিনন্দন ভূচিত্রের একটি রুক্ষ পাথুরে পাহাড়ি এলাকা। ১৯৩২ সালে Ernest Timothy McCluskie, কলকাতার একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জর প্রতিষ্ঠাতা দু লক্ষ অ্যাং ইন্ডিয়ানের কাছে সেখানে 'সেটল' করার আহ্বান জানিয়ে চিঠি পাঠান। ১৯৩৩ সালে The Colonisation Society of India নামক একটি সংস্থা ভারতবর্ষে অ্যাং ইন্ডিয়ানদের জন্য নিজস্ব একটি 'মুলক' (homeland) প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতির শেয়ার বিক্রি ও শেয়ারগ্রহীতাদের মধ্যে জমি বণ্টন করতে শুরু করেন । দশ বছরের মধ্যে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ ৪০০ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিবারের আবাসস্থল হয়ে ওঠে। যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ - স্বাধীনতালাভ পরবর্তীকালে তাদের অনেকেই ভারত ছেড়ে অন্যত্র 'সেটল' করেন। স্বভাবতই, দু'লক্ষ সম্ভাব্য অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান আবাসিক ও চারশো আবাসিক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিবারের অধিকাংশই ছিলেন রেল কর্মচারী; ভারতবর্ষে রেলব্যবস্থার বিকাশ তথা বিবর্তনে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। ঔপনিবেশিককালে এবং স্বাধীনতালাভ পরবর্তী দুই দশকে ভারতীয় রেলের চালক, গার্ডদের চাকরি ছিল অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের একচেটিয়া; রেলের অপরাপর প্রায়োগিক শাখার চাকরিতেও তাঁদের প্রাধান্য ছিল। তাই উপমহাদেশের রেলব্যবস্থার ইতিহাসচর্চাকারীদের কাছে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ তীর্থস্থান সমতুল।

ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ বরকাকানা জংশনের ৬৫ কিলোমিটার দূরে ভারতীয় রেলপথের পূর্ব মধ্য এলাকার ধানবাদ ডিভিশনের এক ছোট্ট স্টেশন। তিনটে প্ল্যাটফর্ম সমুদ্রতল থেকে ৪৭৮ মিটার উপরে, সারাদিনে চোদ্দটা ট্রেন সেখানে থামে। তার এদিকে খালারি স্টেশন, ওদিকে মহুয়ামিলন। নয়েল টমাস, প্রাক্তন ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ডিজেল) Waltair তাঁর স্মৃতিকথায় ('Footprints on the Track' ISBN: 978-81-928188-0-1) এই স্টেশন নিয়ে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। পঞ্চাশের দশকে তদানীন্তন অবিভক্ত পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন কে জি মুখারজি। রাজকীয় চেহারা ও সাহেবসুলভ আদবকায়দার জন্য অধস্তনদের কাছে তিনি ছিলেন কিং জর্জ মুখারজি। এহেন মুখারজিসাহেব একবার বেরিয়েছিলেন সি আই সি সেকশন পরিদর্শনে, যাচ্ছিলেন ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ পেরিয়ে খালারি; অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানি (ACC)-র লোকজনদের সঙ্গে সিমেন্ট পরিবহণে ওয়াগনের লভ্যতা আলোচনা সংক্রান্ত এক মিটিং-এ। সেই বিশেষ রেলগাড়ি ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জের সমীপবর্তী হতেই আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থায় তিনি চালককে বললেন ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে গাড়ি থামাতে। গাড়ি থামল। মুখারজিসাহেব সেলুন থেকে লাফ দিয়ে নামলেন নিচু প্ল্যাটফর্মে, হাঁটা লাগালেন স্টেশনের একমাত্র চায়ের দোকানটির দিকে। তার সঙ্গীসাথী অধস্তনরা প্রায় ছুটলেন সাহেবের সঙ্গে তাল রাখতে। একজন দৌড়ে গিয়ে ফিসফিস করে চায়ের দোকানের মালকিন Mrs. Kearney-কে বললেন 'জি এম সাব আয়ে হ্যায়'। মুখারজিসাহেব হতচকিত Mrs. Kearney কে দিনের সময়ের শুভেচ্ছা জানালেন (গুড মর্নিং, গুড নুন, গুড আফটারনুন)। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন 'How is Bill keeping? Give my regards to Bill'। এতক্ষণে Mrs. Kearney মুখারজিসাহেবকে চিনতে পারলেন। মুখারজিসাহেব যখন সাহেব হননি, নেহাতই সদ্য চাকরিতে যোগ দেওয়া এক শিক্ষার্থী, তখন Bill Kearney তরুণ ছাত্রটিকে পক্ষপুটে নিয়ে কাজ শিখিয়েছিলেন। সময় কেটেছে, বিল অবসর নিয়ে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে থিতু হয়েছেন। Mrs. Kearney বাড়ির তৈরি ব্রেড বিস্কুট নিয়ে প্ল্যাটফর্মের টি স্টলটি চালান। সময় ছিল না, মিটিং-এ যাওয়ার তাড়া তো আছেই, তদুপরি আচমকা এভাবে গাড়ি থামলে লাইনের পরের গাড়িও আটকে যাবে, তাই মুখারজিসাহেবের বিলের বাংলোয় আর যাওয়া হয়ে উঠলো না। হুইশিল বাজল,

পতাকা নড়ল, রেলগাড়ি ফের চলতে শুরু করল। রেখে গেল ধ্রুপদী শিষ্টাচারের এক অভিজ্ঞান।
স্টেশনের লোকজনদের সঙ্গে আলাপচারিতায় জানালাম আমার আগমনের হেতু। তারা সোৎসাহে আমাকে স্টেশন চত্বর চষে ফেলার অনুমতি দিলেন। কিন্তু তিনটে প্ল্যাটফর্ম এমুড়ো ওমুড়ো করেও গাউনপরা কোন মহিলার দেখা মিলল না। আমি কি আশা করেছিলাম ওই ঘটনার সত্তর বছর পরেও Mrs. Kearney ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জের প্ল্যাটফর্মে চা আর কুকি বিক্রি করবেন! আমি কি কচি খোকা? আটান্ন পেরিয়ে আমি কি জীবনের অনিত্যতা বুঝিনি? তা নয়। আমি শুধু এইটুকু আশা করেছিলাম যে ঐতিহ্যটি বজায় থাকবে, ছোটা ইংল্যান্ডের রেল প্ল্যাটফর্মে এখনও চা আর কুকি পাওয়া যাবে, স্টলটি চালাবেন কোন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ম্যাডাম। বিষণ্ণচিত্তে তাই সমকালীন বাস্তবতা মানতে হল।

২০১৭-র ১২ নভেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জের ক্যান্টিন মজিদকে নিয়ে একটি ফিচার বেরিয়েছিল। বছর ষাটেকের মজিদ এখন ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে পর্যটকদের গাইডের কাজ করেন। একদা ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ স্টেশনে তাঁর ক্যান্টিন ছিল, সেই ক্যান্টিনের শিঙাড়া নাকি ছিল বিখ্যাত; সেই সূত্রেই তিনি আজ ক্যান্টিন মজিদ। তাকে ধরা হল, গাইডের পারিশ্রমিকটি হাতে ধরিয়ে দেওয়ার পর তিনি মুখ খুললেন। Mrs. Kearney কে তিনি দেখেননি, তবে তার কথা জানেন, আমার মত বই পড়ে নয়, অভিজ্ঞতায়। অ্যাংলো ইন্ডিয়ানেরা ছোটা ইংল্যান্ড ছেড়ে যাওয়ার তথা প্রয়াত হওয়ার পর সেই শূন্য রেল প্ল্যাটফর্মে তার পদক্ষেপ, ক্যান্টিন স্থাপন; বাড়ির তৈরি ব্রেড বিস্কুট প্যাস্ট্রির সংস্কৃতিতে শিঙাড়ার অনুপ্রবেশ। জনরুচি তো এমনি করেই বদলায়!

বিকাল ঘনাল। এদিকে সূর্য দেরি করে ডোবে। রেললাইন, পাহাড়, দূরের বাড়িঘর, সব যেন অবাস্তবতায় মিলিয়ে গেল। দুজনে বসে রইলাম প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে; কিছুক্ষণের জন্যে ফিরে গিয়েছিলাম বিগত সেই দিনগুলিতে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের বলা হয় 'Unsung Heroes of the Railways in India'। এত সহজে আমরা বিস্মৃত হলাম তাঁদের! পঞ্চাশের, বিশেষত ষাটের দশকের পর থেকে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা দলে দলে ভারত ছেড়েছেন, তার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ হারিয়েছে তার আকর্ষণ, পরবর্তীকালে কোনরকম উন্নয়নের অভাবে সে এখন নেহাতই এক গ্রাম। তবুও সাব, মেমসাব, বাংলো, প্যাস্ট্রি, গ্রামীণ গির্জার মধ্যে ক্বচিৎ শোনা যায় ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের দীর্ঘশ্বাস।
নিতাই কবিয়াল (কবি, তারাশঙ্কর) আক্ষেপ করেছিল 'এই খেদ আমার মনে - ভালবেসে মিটল না সাধ, কুলাল না এ জীবনে! হায় - জীবন এত ছোট কেনে? এ ভুবনে?' আমি মোটাদাগের মানুষ, পেটের চিন্তাতেই জীবন গেল, উচ্চতর কোন চিন্তার সময় বা সুযোগ কোনটাই মেলেনি, তার উপরে বাবা মারধোর করে কমবয়সে বিবাহ দিয়ে দেওয়ায় হৃদয়বৃত্তির চর্চাও যথাযথ করে ওঠা হয়নি, আবেগের কিঞ্চিৎ ঘাটতি নিয়েই তাই জীবন গেল। তবু, ওইসময় ওইখানে দাঁড়িয়ে, নিতাই কবিয়ালের সঙ্গে সহমর্মিতা অনুভব করলাম।

চতুর্থ দিনঃ
আমাদের হোটেলটি ছিল রাঁচি মেন রোডে; তার ঠিকানায় লেখা অপোজিট ডেলি মার্কেট। সকালবেলায় কিছু করার না থাকায় অভ্যাসবশে ঢুঁ মারা গেল। ফুলকপি, পাতিলেবু, শশা, কড়াইশুঁটি, সিম বরবটির সম্মিলিত হ্রেষা ধ্বনি, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, মন ভালো হয়ে যায়। তারপর মধ্যাহ্নভোজ, আর কত কত যুগ পরে দ্বিপ্রাহরিক সুখনিদ্রা।
ফেরার গাড়ি ১৮৬১৬ হাতিয়া-হাওড়া ক্রিয়াযোগ এক্সপ্রেস রাঁচি আসে রাত নটা পঁচিশে।। পরদিন সকাল ছটায় সাঁতরাগাছি।

~ *রাঁচির আরও ছবি* ~

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অডিট ও অ্যাকাউন্টস বিভাগের কর্মী তপন পাল বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য। ভালোবাসেন বেড়াতে আর ছবি তুলতে। 'আমাদের ছুটি'-র জন্যই তাঁর কলম ধরা। সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন 'আমাদের ছুটি'-র সঙ্গেও।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly , please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory .

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011-18 - AmaderChhuti.com • W eb Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

মিজোরামে নতুন বছর

সুবীর কুমার রায়

~ মিজোরামের আরও ছবি ~

মিজোরাম হাউস থেকে মিজোরাম রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি পত্র হাতে পাওয়ার সাথে সাথেই চাল্টলাঙ্গ(CHALTLANG), চামফাই(CHAMPHAI) ও থেনজল(THENZAWL) গেস্টহাউস বুক করার জন্য ফোন করলাম। চাল্টলাঙ্গ গেস্টহাউস কর্তৃপক্ষ আমাদের শুধুমাত্র আইজল পৌঁছনোর দিন, অর্থাৎ একত্রিশে ডিসেম্বরের জন্য ঘর বুক করে দিয়ে জানালেন, পরের দিনে কোন ঘর খালি না থাকায় হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। তাঁরা আমাদের সুবিধার্থে অবশ্য একটি হোটেলের ফোন নাম্বার দিলেন। আমরা সেইমতো পয়লা জানুয়ারির জন্য ঘর বুকিং-এর বিষয় খোঁজখবর নিয়ে রাখলাম।

চামফাই গেস্ট হাউসের ভদ্রলোকটি জানালেন যে তিনি এখন বাইরে আছেন, আমি যেন তাঁকে পরে ফোন করি। যদিও তিনি জানালেন যে আমাদের প্রয়োজনীয় দিন দুটির জন্য ঘর পাওয়া যাবে। আমি তাঁর কথায় সম্মতি জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিয়ে থেনজল গেস্টহাউসে ফোন করলাম। এখানে আবার এক ভদ্রমহিলা ফোন ধরলেন। ইনি কোন ভাষায় কথা বলেন বোঝার সুযোগ পেলাম না। হিন্দি এবং ইংরেজি, দু'ভাষাতেই আমার কথা শুনে তিনি শুধু 'হ' বললেন। সন্দেহ হওয়াতে আমি কেটে কেটে, সময় নিয়ে, তাঁকে নির্দিষ্ট দিনে প্রয়োজনীয় তিনটি ঘর পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি আবারও শুধু 'হ' বললেন। আমি তাঁকে ঘর বুকিং-এর জন্য কিভাবে টাকা পাঠাবো জিজ্ঞাসা করায়, একই সুরে তাঁর অভিধানের একমাত্র শব্দ 'হ' বললেন।

বিকালের দিকে চামফাই গেস্টহাউসে আবার ফোন করতে, আগের সেই ভদ্রলোক আবার সেই একই কথা বললেন, তিনি বাইরে আছেন, আমি যেন তাঁকে পরে ফোন করি। তবে তাঁর কথায় জানা গেল যে তিনি গেস্টহাউসেই থাকেন, ঘর পাওয়া যাবে, কোন অসুবিধা হবে না। থেনজলের ভদ্রমহিলার 'হ'-এ আশ্বস্ত হতে না পেরে সন্ধ্যার সময় তাঁকে তাঁর মোবাইলে এস.এম.এস. করে সকালের কথোপকথন উল্লেখ করে, থেনজলের গেস্টহাউসে থাকার দিনক্ষণ পুনরায় জানিয়ে, তিনটি ঘর আমাদের জন্য রাখার অনুরোধ করলাম। কিছুক্ষণ পরে তাঁর পাঠানো এস.এম.এস. উত্তরে জানা গেল, নির্দিষ্ট দিনে আমাদের জন্য তিনটি ঘর রাখা থাকবে। আমাদের তাঁর গেস্টহাউসে নির্দিষ্ট দিনে চলে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে আশ্বস্ত করা হল, আমাদের কোনরকম অসুবিধা হবে না। যাক, একটা সমস্যা মিটল।

চামফাই গেস্টহাউসের ভদ্রলোককে ফোন করলাম। এবার আমার বক্তব্য শুনে তিনি প্রথমে চারটি ঘরের কথা বললেও, আমার অনুরোধে তিনি তিনটি ঘর নির্দিষ্ট দু'টি দিনে আমাদের জন্য রেখে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তবু নিশ্চিন্ত হতে আমাদের ওখানে যাওয়ার বিস্তারিত, অর্থাৎ কোন গেস্টহাউস, ক'টা ঘর, কোন কোন দিনের জন্য, কতজন যাব, ইত্যাদি তথ্য বিস্তারিত ভাবে দিয়ে, কনফার্ম করার অনুরোধ করে তাঁকে এস.এম.এস. পাঠালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই "নো প্রবলেম, ওয়েলকাম" লেখা এস.এম.এস. পেলাম। এবার নিশ্চিন্ত, মেঘালয়ে থাকার ব্যবস্থা ওখানে গিয়ে করব। মিজোরামে থাকার ব্যবস্থাও পাকা হয়ে গেল।

লেংপুই এয়ারপোর্ট, আইজল

গোড়াতে আমাদের পরিকল্পনা ছিল ট্রেনে যাওয়ার, সেইমতো যাওয়া-আসার টিকিট কাটাও ছিল, কিন্তু অযথা অনেক সময় নষ্ট ও শারীরিক কষ্টের কথা ভেবে মিজোরাম হাউস থেকে অনুমতি পাওয়ার পরে যাত্রার দিন দু'দিন পিছিয়ে বিমানের টিকিট কাটা হল। যাবার ট্রেনের টিকিটও বাতিল করা হল। নির্দিষ্ট দিনে, অর্থাৎ বছরের শেষ দিনটায় ছোট্ট বিমানে করে আইজলের ছবির মতো সুন্দর সাজানো গোছানো, ঝাঁ চকচকে, হিমালয়ের মিষ্টি গন্ধ মাখা, ছোট্ট বিমানবন্দর 'লেংপুই' গিয়ে নামা গেল। কিন্তু বিমানবন্দর থেকে বেরতে গিয়ে টের পেলাম, বিপদ ও ঝামেলা আমাদের এখনও পিছু ছেড়ে যায় নি।

ট্রেনে যাওয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের মিজোরামে ঢোকার কথা ছিল পরের বছরের প্রথম দিনটিতে। অনুমতিপত্রেও আমাদের পূর্ব ইচ্ছামতো তাই লেখা আছে। কিন্তু আমরা একদিন আগেই মিজোরামে এসে হাজির হয়েছি। কাউন্টারে কর্তব্যরত সিকিউরিটি অফিসার ব্যাপারটা দেখাতে, আমার তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ার মতো অবস্থা। যাওয়ার আনন্দে, উত্তেজনায়, এই ব্যাপারটা মনেও পড়ে নি, ভেবেও দেখি নি। আমার তখন আশা ভরসা একটাই, রাজ্যটা পশ্চিমবঙ্গ নয়। গোটা ব্যাপারটা ওই অফিসারকে বুঝিয়ে বললাম। উনি হাতে একটা কলম নিয়ে বারবার তারিখটার কাছে নিয়ে

যাচ্ছেন আর বলছেন–"বুঝতে পারছি, কিন্তু যিনি এই অনুমতিপত্রে সাক্ষর করেছেন, তিনি অনেক উচ্চপদস্থ অফিসার। ওখানে আমার কলম চালানো উচিত হবে না।" ব্যাপারটা হয়তো সত্যিই তাই, কারণ মিজোরাম হাউসে অনুমতিপত্র তৈরি হওয়ার পরে অনেকক্ষণ সাক্ষরকারী অফিসারের জন্য বসে থাকতে হয়েছিল। শেষে লাল বাতি জ্বালানো গাড়ি নিয়ে এক ভদ্রলোক এসে সমস্ত অনুমতিপত্রে সাক্ষর করেন। যাইহোক শেষ পর্যন্ত আগের মতোই কলমটি তারিখের কাছে নিয়ে এসে ভদ্রলোক কথা বলতে বলতেই হঠৎ মিজোরামে ঢোকার তারিখটি কেটে আগের দিন করে দিয়ে শুধু বললেন, "আপনারা অসুবিধায় পড়েছেন তাই করে দিলাম।" আমাদের রাজ্যে হলে এই কাজটির জন্য খরচ হয়তো একটু বেশিই হত, আর এখানে কোনও অর্থব্যয়ের পরিবর্তে, তাঁর মুখ থেকে একবার ওয়েলকাম শব্দটি শুনতে হল এবং করমর্দন করতে হল। আমরা বিমানবন্দরের বাইরে পা রাখলাম।

চান্টল্যাঙ্গ যাওয়ার পথে

বিমানবন্দর থেকে সুন্দর পাহাড়ি রাস্তা ভেঙে একসময় আমরা চান্টলাঙ্গ গেস্টহাউসে এসে পৌঁছলাম। বাইরে থেকে তত সুন্দর মনে না হলেও অনেকটা জায়গা জুড়ে তৈরি চারতলা বিশাল বাড়িটার ভিতরটা বেশ সুন্দর। কিন্তু একেবারে যেন শ্মশানের নিস্তব্ধতা। রিসেপশনটা তো খুবই সুন্দর, বাড়ির চারপাশটাও ফুলের ও অন্যান্য শৌখিন গাছ দিয়ে সাজানো। কিন্তু তবু বোঝা যায় পরিচর্যা ও দেখভালের যথেষ্ট অভাব, কতদিন সুন্দর থাকবে বলা শক্ত। এল প্যাটার্নের বাড়ির চারতলায় পরপর তিনটি ঘর দিয়ে আমাদের একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে অনুরোধ করা হল। আমরা ছাড়া এতবড় বাড়িতে আর কোনও বোর্ডার নেই। স্নান সেরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ডাইনিং হলে খেতে গেলাম। আমরা সাতজন বেশ বড় হলঘরের একপ্রান্তে বসলাম। আর কোনও লোক নেই। খাবারও অতি সাধারণ, ভাত, ডাল, একটা সবজি ও ডিমের ঝোল। পরিবেশক জানালেন, আমরা আজ আসব বলে এবেলা খাবারের ব্যবস্থা করতেই হয়েছে। গেস্টহাউসে কোন কর্মী নেই, তাই যেন রাতের খাবার ব্যবস্থা অন্যত্র কোথাও করে নিই।

খাওয়া শেষ করে নীচে রিসেপশনে অন্য কোথাও খাওয়ার অসুবিধার কথা জানাতে গেলাম। কাউন্টারের ভদ্রলোক জানালেন যে, বছরের শেষ দিন ও নতুন বছরের প্রথম দিন এখানে সবাই উৎসবে মেতে থাকে। তাই গেস্টহাউসে খাবার তৈরি করা তো দূরের কথা, ঘরে পানীয় জল দেওয়ার লোক পর্যন্ত নেই। গোটা গেস্টহাউস ফাঁকা, লোকের অভাবে কাউকে বুকিং দেওয়া হয় নি। এতক্ষণে আমাদের আগামীকাল অন্য হোটেলে থাকতে বলার রহস্য উদঘাটন হল। বললাম, ঘরে পানীয় জল দেওয়ার প্রয়োজন নেই, ওই কাজটা নিজেরাই করে নেব। তবে আগামীকাল আর অন্য কোনও হোটেলে যাচ্ছি না, এখানেই থেকে যাব। আর এই ঠান্ডার মধ্যে মেয়েদের নিয়ে কোথায় খেতে যাব, আজ রাতের খাবারটা যেভাবে হোক, একটু করে দেবার ব্যবস্থা করা হোক। ভদ্রলোক হ্যাঁ বা না কিছুই না বলে চুপ করে রইলেন।

এখানে আমাদের তিনটে ঘরেই তিনটে ইলেকট্রিক কেটলি রাখা আছে দেখলাম। আমাদের সঙ্গেও একটা এসেছে। সঙ্গে প্রচুর টি ব্যাগ নিয়ে আসা হয়েছে, কাজেই চা খাওয়ায় কোন অসুবিধা নেই। তরুণ জানালো যে সে বিকালে পাঁউরুটি, জ্যাম বা জেলি, ডিম, আলু, ইত্যাদি কিনে আনবে। বলল, আলু ও ডিম ভাগ করে করে চারটে কেটলিতে সিদ্ধ করে নিতে পারলে, জলখাবার, প্রয়োজনে রাতের খাবারের সমস্যাও মিটবে। আমরা তার এই প্রস্তাব নিয়ে ঠাট্টা তামাশা শুরু করে দিলাম।

বিকাল বেলা পায়ে হেঁটে ঘুরবার পথে সামান্য রাস্তা হেঁটেই দেখলাম, রাস্তার দুপাশে পরপর দোকানগুলো সব বন্ধ। রাস্তা একবারে শুনশান, এক-আধজন যুবক যুবতী ছাড়া একটা লোকও চোখে পড়ল না। বুঝতে পারছি আমাদের মিশন-কেটলি 'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে' হয়েই থেকে গেল, ভূমিষ্ঠ হবার সুযোগ আর পেল না। হাঁটতে হাঁটতে বেশ খানিকটা রাস্তা যাবার পর, একটা দোকান খোলা দেখে ঢুকে পড়লাম। সবকিছুই পাওয়া গেল, যদিও জ্যামের শিশিটা স্থানীয় কোন প্রস্তুতকারকের তৈরি ও প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত ছোট, আর তিন বছর আগের কালচে রঙের এবড়ো-খেবড়ো আলু চল্লিশ টাকা কিলো। খনার বচনের কথা মনে পড়ল - যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় ন'জন। আমরা তো মাত্র সাতজন, ওই জ্যামের শিশিতে অসুবিধা হওয়ার কথা ধোপে টিকবে না। তাই 'নেই মামার চেয়ে কানা মামাও ভালো' ভেবে, সবকিছু কেনাকাটা করে জনশূন্য রাস্তা দিয়ে এক চক্কর শহর পরিক্রমা করে গেস্টহাউসে ফিরলাম।

চান্টল্যাঙ্গ গেস্টহাউসে

রিসেপশনের আরামদায়ক বেতের সোফায় দেখলাম দু'চারজন বসে আলাপচারিতায় ব্যস্ত। নিজেদের ঘরে ঢুকবার আগে দেখলাম আমাদের পাশের দুটো ঘরে লোক এসেছে। খাওয়ার জল আনতে গিয়ে জানা গেল আজ হঠাৎ দু'চারজন সরকারি আমলা দরকারি কাজে এসে উপস্থিত হওয়ায়, রাতের খাবারের ব্যবস্থা করতেই হচ্ছে, তাই আমরাও সেই খাবারের থেকে কিছু প্রসাদ পাব। তবে লোকের অভাব, তাই খাবার পেতে একটু রাত হতে পারে। মনে হল সেই সরকারি আমলাদের খুঁজে বার করে একটা চুমু খেয়ে আসি। রাতের খাবারের ব্যবস্থা যখন হয়েই গেল, তখন সদ্য কিনে আনা খাবারের সদব্যবহার করে ফেলা উচিৎ। অন্তত পাঁউরুটি আর ডিমগুলোর কথা ভেবে সান্ধ্যভোজের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। কাল এগুলোর প্রয়োজন নাও হতে পারে। প্রয়োজন হলে কালকের কথা কাল ভাবা যাবে। শাস্ত্রেই তো বলা আছে, মিজোরামে এনেছেন যিনি, খাবার জোগাবেন তিনি।

তিন ঘরে চারটে কেটলিতে আলু ধুয়ে, খোসা ছাড়িয়ে, ছোটছোট করে কেটে, সিদ্ধ করতে দেওয়া হল। ডিমও সিদ্ধ হল। নুন, মরিচ গুঁড়ো ও মিষ্টি আমাদের সঙ্গেই আছে। ফলে জ্যাম মাখানো রুটি, নুন-মরিচ গুঁড়ো দেওয়া আলু আর ডিমসিদ্ধ এবং শেষপাতে মিষ্টির পর এক রাউন্ড কফিসেবন করে মহাভোজ সাঙ্গ হল। তরুণটা বোকা হলেও মাথায় বুদ্ধি যথেষ্টই রাখে, আর তাই ও বা ওর পরিবার আমার সবথেকে প্রিয় ভ্রমণসঙ্গী ও আত্মীয়সম।

রিসেপশন থেকে ফোন নাম্বার নিয়ে গাড়ির জন্য সকালেই ফোন করে রেখেছিলাম। অনেক চেষ্টা অনেক সাধ্যসাধনার পর, ও প্রান্ত থেকে ফোন ধরে আমার বক্তব্য শুনে জানিয়েছিল সন্ধ্যার সময় গেস্টহাউসে এসে দেখা করবে। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ অতিক্রম করে রাত হয়ে যাওয়ায় আবার

ফোন করলাম। অনেক চেষ্টার পরে ও প্রান্ত দয়া করে ফোন ধরলেও, তার বক্তব্য পরিষ্কার হলনা। পরের দিন সকালে এসে কথা বলবে বলে জানিয়ে ফোন কেটে দিল। মহা মুশকিল, কাল সকালেই আমাদের গাড়ি নিয়ে বেরোবার কথা, শেষে ওর অপেক্ষায় থেকে একটা গোটা দিন নষ্ট হবে। আবার রিসেপশন কাউন্টারের সেই ভদ্রলোকের শরণাপন্ন হলাম। ভদ্রলোক আবারও জানালেন বছরের প্রথম ও শেষ দিনটি এখানে সবাই উৎসবে মেতে থাকে, সমস্ত দোকানপাট বন্ধ রেখে আনন্দে মেতে থাকে। এই দুদিন গাড়ি পাওয়ায় সমস্যা দেখা দিতে পারে। আরও খান দু-এক ফোন নাম্বার নিয়ে চেষ্টা করে বিফল হয়ে, শেষে আবার আগের সেই ফোন নাম্বারে ফোন করে একটু মেজাজ দেখিয়েই বললাম যে, সে যদি আমাদের সাথে যেতে চায়, তাহলে এখনই এসে দেখা করে যাক, তা নাহলে আমরা অন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে নেব। উত্তরে বিড়বিড় করে সে কী যে বললো বোঝা গেল না।

কী করা যায় বুঝতে পারছি না। এই রাজ্যে প্রায় সাতাশি শতাংশ অধিবাসী খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। বছরের শেষ ও প্রথম দিনটি উপভোগ করার জন্য এই খ্রিস্টান প্রধান রাজ্যে বেছে বেছে এই দিনটাতে আসা। তার ফল যে এমন উল্টো হবে কে জানতো। আমাদের রাজ্যে বড়দিন, বর্ষশেষ, বা নববর্ষের দিনে রাস্তাঘাট-দোকানপাট আলোকমালায় সজ্জিত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে পার্ক স্ট্রিট বা ওই জাতীয় রাস্তায় তো সারা রাত লোকের ভিড় উপচে পড়ে। আমরা বাঙালি অখ্রিস্টানরাও সাহেব-মেম সেজে, বাড়িতে তালা লাগিয়ে, খ্রিস্টান প্রধান এলাকায় বড়দিন বা নববর্ষ পালন করতে যাই। কিন্তু এরা এই দিনগুলিতে সমস্তকিছু বন্ধ রেখে, পরিবারের সঙ্গে নিজের নিজের বাড়িতে আনন্দে মেতে ওঠে। আমাদের এই রাজ্যে বড় কোন রাজনৈতিক দলের ডাকা বাংলা বন্ধেও রাস্তাঘাট এত ফাঁকা থাকে না, সমস্ত দোকানপাট এইভাবে বন্ধ থাকে না।

যাইহোক প্রভু যীশুর অসীম দয়া ও করুণায়, আরও বেশ কিছুক্ষণ পরে 'কিমা' নামে বছর ত্রিশের একজন এসে হাজির হল। জানাল যে আজ ও আগামীকাল তাদের উৎসব, তাই আমরা পরশু গেলে তার পক্ষে সুবিধা হয়। আজ ও আগামীকাল গাড়ি বা ড্রাইভার পাওয়া প্রায় অসম্ভব। আমরা তাকে জানালাম যে আমাদের হাতে সময় খুব কম, কাজেই দু'দিন আইজলে বসে থাকা কোনও মতেই সম্ভব নয়। কাজেই সে যদি আমাদের ইচ্ছামত মিজোরামের জায়গাগুলো দেখাতে নিয়ে যেতে চায়, তাহলে কাল সকালে গাড়ি নিয়ে আসুক, তা না হলে আমরা অন্য গাড়ির সঙ্গে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে নেব। এই এক বেলাতেই বুঝতে পেরেছি, আমাদের মতো পাগল ছাড়া মিজোরামে টুরিস্ট বিশেষ একটা আসে না। এখনো পর্যন্ত আমাদের তো একজনও চোখে পড়ে নি। আমাদের প্রতি দয়া বা সাহায্যের হাত বাড়ানো, না খদ্দের হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে জানি না, সে আমাদের ইচ্ছানুযায়ী মিজোরামের জায়গাগুলো ঘুরিয়ে দেখাবার জন্য দরদস্তুর করে ভাড়া ঠিক করে, কাল সকালে টাটা সুমো নিয়ে আসবে কথা দিয়ে চলে গেল।

রাতে মহামান্য সরকারি আমলাদের সাথে রুটি তরকারি খেয়ে, রাস্তায় একটু পায়চারি করে ঘরে ফিরলাম। আমাদের পাশের ঘরেই এক ভদ্রলোক উঠেছেন। উনি বাঙালি, তাই নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আলাপ করলেন। জানা গেল তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অতি উচ্চপদস্থ কর্মচারী। সরকারি কাজে এখানে প্রায়ই আসতে হয়। এখান থেকে ওঁকে মিজোরামের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হবে। আমরা মায়ানমার-এ হার্ট লেক দেখতে যাব শুনে তিনি জানালেন যে, একবার কলকাতা থেকে আসা তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের তিনি হার্ট লেক দেখাতে নিয়ে গেছিলেন। তিনি সঙ্গে থাকায় তাদের সীমান্তের ওপারে নিয়ে যেতে কোনও অসুবিধা হয় নি। আগে জানলে তিনি আমাদের হার্ট লেকে যাবার ব্যবস্থা করে দিতেন, কিন্তু তাঁর হাতে এখন আর সেই সময় নেই। আমরা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, বই-এ পড়েছি যে হার্ট লেক দেখার জন্য মায়ানমারে ঢুকতে কোনও ভিসা পাসপোর্টের প্রয়োজন হয় না। তিনি বললেন এটা সবার জন্য নয়। আমাদের সাহায্য করতে না পারার জন্য তিনি আর একবার দুঃখ প্রকাশ করে বললেন– দেখুন চেষ্টা করে। যে যার ঘরে চলে গেলাম। মিজোরামে সুরাপান ও সুরা বিক্রয় নিষিদ্ধ হলেও, এই ব্যাপারে যে কড়াকড়ি গুজরাটে দেখেছি, তার ছিটেফোঁটাও এখানে লক্ষ্য করি নি। রাস্তার পাশে, এমনকী আমাদের গেস্টহাউসের আনাচেকানাচে সুরার খালি বোতলের সংখ্যাই তার সাক্ষ্য বহন করে। আজ বর্ষপূর্তির উৎসবের যা নমুনা দেখলাম, আগামীকাল সুস্থ অবস্থায় কিমা সাহেব আসলে হয়। আস্তে আস্তে রাত বাড়ছে। নিঃশব্দ গেস্টহাউসের ব্যালকনিতে চেয়ার নিয়ে বসে দূরের অন্ধকারে নানা রঙের আলোর মালা দেখছি। রাত বারটা বাজতেই শুরু হলো আতসবাজি জ্বালানো। জ্বালানো বললাম ফাটানো নয়, কারণ এরা আমাদের মতো শব্দবাজি ফাটিয়ে সকলকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ উপভোগ করার মতো এখনও হয়ে উঠতে পারে নি।

সকাল সকাল চা খেয়ে তৈরি হয়ে কিমা চন্দ্রের আসার অপেক্ষায় বসে রইলাম। আজ ওর সঙ্গে রেইক যাব। ফেরার পথে আইজল শহরের দ্রষ্টব্য যা যা আছে দেখে এখানেই ফিরে আসা। খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, কিমা তার টাটা সুমো নিয়ে উপস্থিত হল। আমরা আর এতটুকু সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়লাম। আইজল থেকে রেইক-এর দুরত্ব উনত্রিশ কিলোমিটার মতো। কিমা জানালো রেইক পৌঁছতে ঘন্টাখানেক মতো সময় লাগবে।

রেইক যাওয়ার পথে

সুন্দর সবুজ জঙ্গল ও ঝোপেঘেরা রাস্তা দিয়ে আমাদের গাড়ি একসময় মামিট জেলার রেইক এসে পৌঁছল। রেইক-এর উচ্চতা পাঁচ হাজার ফুটের মতো। মিজোরামের কোন অঞ্চলের উচ্চতাই খুব একটা বেশি নয়, সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা মাত্র সাত হাজার দুইশত পঞ্চাশ ফুট। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল কথাটা ভূগোল বইতে পড়তাম, এখানে এসে মালুম হল নাতিশীতোষ্ণ কাকে বলে। কী আরামদায়ক জায়গা বোঝাতে পারবো না। শুনেছিলাম রেইক একটি হেরিটেজ ভিলেজ। ছোট ছোট কুঁড়েঘর দিয়ে ঘেরা গ্রামটি সত্যিই ভারী সুন্দর। বড় বা আধুনিক স্থাপত্য বিশেষ চোখে পড়ল না। এখানে বিভিন্ন উপজাতির বাসস্থান ও তাদের ব্যবহার্য জিনিস মিজোরাম পর্যটন বিভাগের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষণ করা আছে। গোটা রাজ্যটার প্রায় সমস্তটাই এখনও সবুজ জঙ্গল ও ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ। স্বাভাবিক ভাবে রেইক গ্রামটিতেও ঘন সবুজের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। একটা স্টেডিয়াম দেখতে পেলাম। পরিষ্কার আকাশ থাকলে এখান থেকে বাংলাদেশের কিছুটা দেখা যায়। তবে এই কুঁড়েঘরের সাম্রাজ্যে চোখধাঁধানো কাফেটেরিয়াটা দেখলে সত্যিই অবাক হতে হয়। অনেকক্ষণ সময় রেইক-এ কাটালাম। পায়ে হেঁটে বনজঙ্গল পেরিয়ে অনেকটা পাহাড়ি রাস্তা ভেঙে বেশ উঁচু একটা জায়গায় গেলাম। এখান থেকে চারিদিকের বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। ফিরে এসে কাফেটেরিয়ায় ঢুকলাম। ঝাঁ চকচকে কাফেটেরিয়ায় অর্ডার দিলে খাবার তৈরি করে দেবে। সামান্য চাউ করতে চাউয়ের দামের মতোই অনেক বেশি সময় নিল। একজনও পর্যটক চোখে পড়ল না। এখানে সারা বছরে ক'জন পর্যটক বেড়াতে আসেন সন্দেহ। স্থানীয় মানুষদের এই কাফেটেরিয়ায় খাওয়ার ক্ষমতা বা স্বভাব, কোনোটাই আছে বলে তো মনে হলো না, অথচ এটাকে কী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখেছে দেখে শেখা উচিত। এবার ফেরার পালা। আজই আমাদের আইজল শহরটা ঘুরে দেখার কথা। রেইককে সারা জীবনের মতো বিদায় জানিয়ে, আইজল শহরের উদ্দেশ্যে আমরা গাড়িতে এসে বসলাম।

আইজল-এ দেখার মতো বিশেষ কিছু আছে বলে তো মনে হল না। আর পাঁচটা পাহাড়ি শহরের মতোই। তবে আমরা যেহেতু না জেনে এক অদ্ভুত সময়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, তার খেসারত তো আমাদের দিতেই হবে। এ যেন এক জনপ্রিয় মেগা সিরিয়াল দেখার সময় অযাচিত ভাবে গৃহস্থ বাড়িতে উপস্থিত হওয়ার মতো অবস্থা। আমাদের নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ, অথবা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। আমরা অনাহূতের মতো গাড়ি নিয়ে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে কিমার সঙ্গে ঘুরলাম। কিমা-ই আমাদের বড় বাজার এবং অন্যান্য জায়গা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে

দেখাল। সন্ধ্যার পর নির্বিঘ্নে গেস্টহাউসে ফিরে এলাম। আগামীকাল আমরা চামফাই চলে যাব। যাবার পথে টামডিল লেক দেখে যাওয়ার কথা। কিমার কথানুযায়ী দূরত্ব অনেকটাই এবং রাস্তার অবস্থাও খুব একটা সুবিধার নয়, তাই ওকে আগামীকাল খুব ভোরে আসার কথা বলে বিদায় দিলাম। রাতে আমাদের জন্য রুটি তরকারি ও ডিমভাজার ব্যবস্থা হয়েছে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম।

রেইকে প্রদর্শিত উপজাতীয় কুটির

বেশ সকাল সকাল শেষবারের মতো কেটলি ব্যবহার করে চা ও সঙ্গে আনা টুকটাক খাবার খেয়ে গেস্টহাউসের বিল মিটিয়ে তৈরি হয়ে, কিমার আগমনের অপেক্ষায় বসে রইলাম। দেখতে দেখতে একটু বেলা হয়ে গেল, কিন্তু কিমা সাহেবের দেখা মিলল না। রাস্তা ধরে বেশ খানিকটা ঘুরে এলাম, স্থানে স্থানে বনভোজনে যাওয়ার প্রস্তুতি চোখে পড়ল। আজ যদিও উৎসবের সমাপ্তি ঘটা উচিত, কিন্তু রেশ এখনও কাটেনি দেখলাম। ডানপাশ দিয়ে গেস্টহাউসের পিছন দিকে যাওয়া যায়। সম্ভবত সেখানে কর্মচারীরা থাকে। গেস্টহাউসের চারতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম একটা ম্যাটাডোর জাতীয় গাড়ি এসে আমাদের ঘরের ঠিক সামনের খোলা চত্বরটায় দাঁড়াল। গাড়ি থেকে দু'-চারজন নেমে গাড়ির পিছনের ডালা খুলে রেখে, ওই রাস্তা দিয়ে গেস্টহাউসের পিছনদিকে চলে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখলাম জনা আট-দশ লোক একটা সাদাও নয় গোলাপিও নয় রঙের তাগড়া শুয়োরকে দড়ি দিয়ে বেঁধে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে টানতে টানতে গাড়ির কাছে নিয়ে আসছে। শুয়োরটা সর্বশক্তি দিয়ে ও ভীষণ রকম চিৎকার করে এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আর পাঁচটা ন্যায্য প্রতিবাদের মতো এটাও ধোপে টিকলো না। যেমন ভাবে কোন পোস্ট বা ওই জাতীয় কিছুকে, যাতে পড়ে না যায় বলে চারিদিক দিয়ে টেনে বাঁধা হয়, তাকেও গাড়িটার কাছে টানতে টানতে নিয়ে এসে ওই ভাবে চারিদিক দিয়ে শক্ত দড়ি দিয়ে টেনে বাঁধা হল। এবার একজন একটা বন্দুক নিয়ে এসে কিছুটা দূর থেকে এক গুলিতে তার প্রতিবাদ চিরদিনের মতো স্তব্ধ করে দিল। এতোটা রাস্তা মরা শুয়োর বয়ে আনার কষ্ট লাঘব করতেই বোধহয়, এই ব্যবস্থা। এবার দড়ির বাঁধন খুলে অনেক লোকে বেশ পরিশ্রম করেই তাকে ফাঁকা ম্যাটাডোরে শুইয়ে দিয়ে, নিজেরা গাড়িতে উঠে চলে গেল। পরে শুনলাম ওরা দূরে কোথাও পিকনিক করতে যাচ্ছে। বাকি লোকেরা সেখানে আগেই চলে গেছে। সবাই মনের আনন্দে চলে গেল, শুধু কিমা চন্দ্রের আগমনের অপেক্ষায় নির্জন পুরীতে আমরা সাতজন বসে আছি।

শেষেরও তো একটা শেষ থাকে, অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আমাদের কিমা সাহেব গাড়ি নিয়ে এসে হাজির হলেন। আমাদের কোনও কথা বলার আগেই সে আমাদের আশ্বস্ত করে বলল, কোন অসুবিধা নেই, আমরা টামডিল লেক দেখে ফেরার পথে লাঞ্চ করে সোজা চামফাই চলে যাব। ও যে দয়া করে উৎসবের আনন্দ ছেড়ে এসেছে, এটাইতো সবথেকে বড় পাওয়া, সুবিধেও বলা যেতে পারে। কাজেই এরপর অসুবিধার কোন বদ গন্ধের প্রশ্ন আসতেই পারে না। রাস্তায় কোথায় খাব জানি না, রাজধানী শহর আইজলেরই এই অবস্থা, মাঝপথে ছোট জায়গায় কী পাওয়া যাবে, আদৌ পাওয়া যাবে কিনা, প্রভু যীশুই জানেন। সঙ্গে অবশ্য শুকনো খাবার যথেষ্টই আছে। ভেবে লাভ নেই, "পড়েছি কিমার (মোগলের) হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।" মালপত্র গাড়িতে বাঁধাছাঁদা করে যীশু যীশু করে, এখান থেকে পঁচাশি কিলোমিটার (কোথাও আবার দেখলাম ৬৪ কিমি) দূরের টামডিল লেক হয়ে আমাদের চামফাই যাত্রা শুরু হল।

চামফাই যাওয়ার পথে

নির্মল আকাশ, আবহাওয়াও খুবই আরামপ্রদ, সবথেকে বড় কথা স্থানীয়দের উৎসব ও আমাদের দুশ্চিন্তার দিন শেষ। আমরা যেমন এক রাতের কালীপুজো পাঁচ-সাত দিন ধরে মহানন্দে পালন করি, ওরা বোধহয় এখনও আমাদের মতো অত চালাক হয়ে উঠতে পারে নি। দুপাশে সবুজ পাহাড়ি রাস্তা ধরে আমাদের গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। আইজল থেকে চামফাই-এর দূরত্ব একশো চুরানব্বই কিলোমিটার, কিন্তু আমরা চামফাই যাওয়ার পথে প্রথমে প্রায় পঁচাশি কিলোমিটার দূরের টামডিল লেক দেখে তবে চামফাই যাব। দুটো জায়গা একই পথে পড়ে কিনা, বা এর জন্য অতিরিক্ত কত কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে কিমার কথায় পরিষ্কার হল না।

অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে এসে একটা দোকান থেকে কিছু ফল কিনে নিয়ে, পাশের চা-কাম স্টেশনারি দোকান থেকে চা খেয়ে, কিছু কেক, বিস্কুট, জলের বোতল ইত্যাদি কেনা হল। দুটো দোকানেই মহিলা বিক্রেতা। আমরা দোকান ছেড়ে চলে আসার সময় মহিলাটি একটু হেসে বললেন, 'কেলবা।' এখানে বেশ ভাষা সমস্যা আছে, ওদের উচ্চারণও অদ্ভুত, তাই 'কেলবা' শুনে আমরা নিজেদের মধ্যে একটু হাসাহাসি করলাম। আমরা বাঙালিরা আজকাল মারবো বা প্রহার করবো কথাটা বলা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি, হয়তো ভুলেই গেছি। তার পরিবর্তে এখন যে শব্দটি ব্যবহার করি, তার সাথে মহিলার 'কেলবা'র এত মিল, যে আমরা মহিলাটি কী বলতে চাইছেন বুঝতে না পেরে, নির্ঘাত সেই বিখ্যাত শব্দটি বলছেন বলে নিজেদের মধ্যে নিজেদের ভাষায় ঠাট্টা তামাশা করলাম। মহিলাটি বোধহয় বুঝতে পারলেন যে আমরা তাঁর কথার অর্থ বুঝতে পারিনি, তাই তিনি নিজেই বুঝিয়ে দিলেন যে কেলবা-র অর্থ ধন্যবাদ।

একটা জায়গায় এসে রাস্তা থেকে একটু ওপরে একটা হোটেল দেখিয়ে কিমা আমাদের জানালো যে ফিরে আসার পথে এখানেই দুপুরের খাবার খেয়ে নেওয়ার কথা বলে আসতে। গাড়ি থেকে নেমে উপরে গিয়ে শুনশান হোটেলে কারো দেখা পাওয়া গেল না। বেশ কয়েকবার ডাকাডাকির পর একজন এসে জানালো যে লোকের অভাব, তাই খাবারের ব্যবস্থা করা যাবে না। তাকে একবার অনুরোধ করলাম শুধু চাপাটি আর একটা সবজি বানিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু ভীষ্ম তার পূর্বপুরুষ ছিলেন কী না জানি না, তবে সে তেমনই প্রতিজ্ঞা করে বসে রইল, চাপাটি সে বানাবে না, বানাবে না, বানাবে না। অগত্যা হাল ছেড়ে গাড়িতে ফিরে এলাম।

একসময় মূল রাস্তা থেকে বাঁ দিকে বেঁকে আমরা টামডিল লেক দর্শনে এগিয়ে চললাম, এবং টামডিল লেকের প্রবেশ দ্বারের সামনে এসে

উপস্থিত হলাম। আরও বেশ কিছুটা পথ এসে লেকের পাড়ে হাজির হওয়া গেল। বাঁপাশে একটা গাছে বোর্ড লাগানো। বোর্ডটি আদ্যপ্রান্ত ইংরেজি হরফে লেখা হলেও, বক্তব্য বোঝার উপায় নেই। এখন পর্যন্ত যতটুকু ঘুরলাম, প্রায় কোনও লেখারই মর্মোদ্ধার করতে পারিনি, যদিও সর্বত্রই ইংরেজি হরফে লেখা। প্রথম প্রথম ইংরেজি শব্দে নিজের পাণ্ডিত্য দেখে নিজেরই লজ্জা করবে, মা কালীর দিব্যি বলছি আমারও করেছিল। দশটা শব্দের কোনও বাক্যের অন্তত সাড়ে ন'টার অর্থ জানি না। কোনও কালে শুনেছি বলেও মনে করতে পারি না। এখানে তবু আমরা আসবো বলেই বোধহয়, বোর্ডের একবারে নীচে অপেক্ষাকৃত ছোট হরফে হলেও "INCHARGE, TAMDIL FISH SEED FARM" কথাটা লেখা হয়েছে। ওঃ! কী যে আনন্দ পেলাম, বোঝাতে পারবো না। নিজেকে কেমন সাহেব সাহেব মনে হচ্ছে। পাঁচটা শব্দের পাঁচটার অর্থই আমি জানি, একি কম কথা। কৃতজ্ঞতায় ফার্মের ইনচার্জকে মনে মনে একটা ছোট্ট করে প্রণাম ঠুকে দিলাম।

আইজল

লেকটি খুবই সুন্দর ও বড়, যদিও জলের রঙ মোটেই নীল নয়, বরং একটু সবজেটে, পুকুরের জলের মতো। লেকটি "লেক অফ মাস্টার্ড" নামেও পরিচিত। এক স্বামী-স্ত্রীর চাষ-আবাদের উপাখ্যান, কিন্তু এত বলতে গেলে পাঠক-পাঠিকার ধৈর্যচ্যুতি হতে পারে, তাই ইচ্ছা থাকলেও সেই প্রসঙ্গে আর গেলাম না। তবে এখানে এসে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, এই লেকটি থেকে আইজলের দূরত্ব একশো দশ কিলোমিটার। সবথেকে কাছের শহর, মাত্র ছয় কিলোমিটার দূরের সাইতুয়াল।

দেখলাম দলে দলে লোক লেকের পাড়ে বনভোজন করতে এসেছে। রীতিমত জমজমাট ভিড়। সব দলের সামনেই কাঠের আগুনে রান্না হচ্ছে। আমার একটু বেশি চা খাওয়ার বদভ্যাস আছে। চারদিক ঘুরেও একটা দোকান চোখে পড়ল না। শেষে পাশ দিয়ে যাবার সময় প্রত্যেক দলের হাঁড়ি-ডেকচির দিকে শকুনের দৃষ্টি বুলিয়েও, একটা চা বা কফির পাত্র নজরে পড়ল না। বড় বড় পাত্রে শুধু শুয়োরের মাংস রান্না হয়েছে বা হচ্ছে। দেখলে খাওয়ার প্রবৃত্তি হবে না। আমাদের কিমা সাহেবকে দেখলাম এর, ওর, তার পাত্র থেকে দিব্যি মাংস তুলে মুখে ফেলছে। লেকের একপ্রান্তে একটা ছোট্ট পার্ক আছে। মাঝে একটা ছোট্ট স্নান করার জায়গা। সেখানে বাচ্চাদের সঙ্গে বড়দেরও জলকেলি করতে দেখলাম। হয়তো বাচ্চার বাবা-কাকা হবে। তবে পার্কটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। লেকের জলে ও পাড়ে অদ্ভুত দেখতে হাঁসের দেখাও পাওয়া গেল। লেকটি যথেষ্ট বড় হলেও, তার আয়তন জানার কোন সুযোগ পেলাম না। হয়তো কোনও বোর্ডে ইংরেজি হরফে লেখা আছে, শুধু শব্দের অর্থ না বোঝার জন্য অজানাই রয়ে গেল। আরও বেশ কিছুক্ষণ এখানে কাটিয়ে ফেরার জন্য প্রস্তুত হলাম। এখান থেকে চামফাই সত্যিই কতটা পথ, কিমা বা প্রভু যীশু, অথবা দুজনেই জানেন। তবে জোর দিয়ে সে কথাও বোধহয় বলা যায় না।

লেকের বাইরে এসে চামফাই-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। সঙ্গে আনা কেক, বিস্কুট, কলা, টক আপেল, ডাল ভাজা, বাদাম ভাজা, ইত্যাদি দিয়ে লাঞ্চ সেরে এগিয়ে গেলাম। কিমার হয়তো বেশ অসুবিধাই হল, আমরা এখানে বোধহয় এটাই স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে বাধ্য হলাম। গেট পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়লাম। একসময় আসার সময়ের সেই খাবারের দোকানের পাশ দিয়ে গেলেও আর নতুন করে অনুরোধ করলাম না। দোকানদারের "যে চাপাটি করে করুক, আমি চাপাটি করব না মা" গোছের গোঁ দেখে সময় নষ্ট করতে আর ইচ্ছা হল না। পরিষ্কার রাস্তা - প্রকৃতি সর্বত্রই তার নিজের খেয়ালে, প্রাণীকুলের স্বার্থে, পৃথিবীটাকে সাজিয়ে দিয়েছেন, আমরাই খোদার উপর খোদকারি করে সেই সব নষ্ট করে নিজেদের বিপদ ডেকে এনেছি। মিজোরামে দেখলাম খুব প্রয়োজন ছাড়া প্রকৃতির ওপর হাত দেওয়া হয় নি। এ পথটার অনেকটা রাস্তাও বোধহয় এই একই কারণে কিছু করা হয় নি। বেশ খানিকটা পথ পেরিয়ে কিমা একটা দোকানের সামনে দাঁড় করালো। কিমা ও আমরা এখানে কিছু খেয়ে নিলাম। দোকানদারের কথায় জানতে পারলাম, খাদ্যবস্তুটি আলুর পরোটা। যাইহোক পেটে তো কিছু পড়ল। কেক-বিস্কুট আর কত খাওয়া যায়। আমরা খেলেও, কিমা পারবে না।

আঁকাবাঁকা পথ ধরে, মাঝেমাঝে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাস্তায় নেমে একটু হাত-পা খেলিয়ে, একসময় বড় রাস্তা থেকে বেঁকে চামফাই ট্যুরিস্ট লজে এসে উপস্থিত হলাম।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

টামডিল লেক

~ *মিজোরামের আরও ছবি* ~

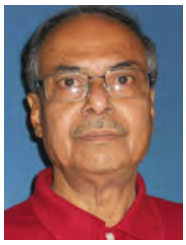

অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অফিসার সুবীর কুমার রায়ের নেশা ভ্রমণ ও লেখালেখি। ১৯৭৯ সালে প্রথম ট্রেকিং – হেমকুন্ড, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, বদ্রীনারায়ণ, মানা, বসুধারা, ত্রিযুগী নারায়ণ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী-গোমুখ ও যমুনোত্রী। সেখান থেকে ফিরে, প্রথম কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসা। সেই ভ্রমণ কাহিনি তিন দশক পরে 'আমাদের ছুটি' পত্রিকায় প্রকাশের মারফত প্রথম পত্রপত্রিকায় লেখা শুরু। এখন ভ্রমণ কাহিনি ছাড়াও গল্প, রম্য রচনা, স্মৃতিকথা নানা ধরণের লেখালেখি করছেন বিভিন্ন জায়গায়।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly , please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory .

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011-18 - AmaderChhuti.com • W eb Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ম্যান্ডেলার দেশ সাউথ আফ্রিকায়

শ্রাবণী ব্যানার্জী

~ *সাউথ আফ্রিকার আরও ছবি* ~

বহুদিন ধরেই সাউথ আফ্রিকা যাওয়ার একটা বাসনা ছিল। কিছুদিন আগে আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সেখানে যাওয়ার একটা সুযোগ ঘটে গেল, সেটা হাতছাড়া করলাম না।

প্লেনে যেতে যেতে ভাবছিলাম, এক অদ্ভুত দেশ এই সাউথ আফ্রিকা - যে দেশে তিনটি রাজধানী আবার লোকজনও নাকি এগারোটা ভাষায় কথা বলে। আফ্রিকাতে অবস্থিত হয়েও এখানে সাদা-কালো-বাদামী, হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান সবাই দিব্যি মিলেমিশে একসঙ্গে থাকে অথচ কে বলবে মাত্র পঁচিশ বছর আগেও এ দেশটির ছিল এক সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ। যদিও মহাত্মা গান্ধীর এ দেশে একুশ বছর বাস ও জাতির জনক নেলসন ম্যান্ডেলার কল্যাণে সাউথ আফ্রিকার ইতিহাস আজ অনেকেরই জানা। তবুও সেটিকে সংক্ষেপে আর একবার ঝালিয়ে নিতে ক্ষতি কী? তাহলে আসুন প্লেনে সে দেশে পৌঁছানোর আগেই সে কাজটা সেরে ফেলি।

পশ্চিমদিক দিয়ে ভারতবর্ষ যাওয়ার রাস্তা খুঁজতে গিয়ে 'কলম্বাস' চোদ্দশো বিরানব্বই-এ একেবারে আমেরিকার মত একটি নতুন মহাদেশই আবিষ্কার করে ফেললেন। তখন সব ইউরোপিয়ানদের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষ। তাহলে মশলার ব্যবসা করেই রাতারাতি বড়লোক হওয়া যাবে! তাই কলম্বাসের দেখাদেখি মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামারও ধারণা হয়ে গেল তিনিও আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষ যাওয়ার একটি পথ বার করে নিতে পারবেন। আফ্রিকার উপকূল ধরে ধরে চলতে চলতে একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে আজকের কেপটাউন অঞ্চলটি ঘুরে একসময় তিনি কেনিয়াতে পৌঁছে যান। সেখানেই 'আহমেদ ইবন মজিদ' নামে এক নাবিক ওঁকে ভারতবর্ষ যাওয়ার সঠিক পথটি দেখিয়ে দেয়। ভারতবর্ষের বস্ত্র আর মশলা ইউরোপে বেচে ভাস্কো-ডা-গামা এতটাই লাভবান হয়েছিলেন যে তার পর থেকে সেই একই রাস্তা ধরে দলে দলে ইউরোপীয়ান ভারতবর্ষে আসতে শুরু করে। বলাবাহুল্য তখনও শর্টকাট করার জন্য মানুষ নির্মিত 'সুয়েজ' ক্যানালের জন্ম হয়নি তাই এই সুদীর্ঘ পথে নতুন করে রসদ তোলার জন্য মাঝপথে সাউথ আফ্রিকার কেপটাউন জায়গাটিকে বেছে নিত নাবিকেরা। খাবার জাহাজে তুলতে গেলে সেই জায়গায় চাষ-আবাদ করাটা আবশ্যক। অতএব সেই সুযোগে হল্যান্ড থেকে বহু কৃষক সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। আজ আমরা তাদের বলি বোয়ারস অর্থাৎ ডাচ ভাষায় কৃষক।

আজকের 'কেপটাউন' জায়গাটি ছিল স্থানীয় উপজাতি 'খোশা'দের বাসস্থান। বন্দুকের সামনে তীর ধনুকের দাঁড়ানো সম্ভব নয় তাই ডাচরা অতি সহজেই তাদের হারিয়ে, হাতেপায়ে শিকল লাগিয়ে এই কালো মানুষগুলিকে চিরকালের তরে দাস বানিয়ে দেয়। সাদারা এদেরকে গরুভেড়ার পর্যায়েই মনে করত কিংবা তারও অধম। 'খোশা' বা স্থানীয় 'ব্যুশম্যান'দের তাক করে গুলি করার জন্য লাইসেন্স পাওয়া যেত কারণ শ্বেতাঙ্গদের কাছে সিংহ শিকারের মত এটাও ছিল দারুণ স্পোর্টস। নেলসন ম্যান্ডেলা ও টুটু-ও এই খোশাদেরই একজন ছিলেন। ডাচদের পর কিছু ফরাসী ও জার্মানরাও এসে এ দেশটিকে পাকাপাকিভাবে নিজেদের বাসস্থান করে নেয়।

আঠারোশো পনেরো সালে ফ্রান্সের সঙ্গে ইংল্যান্ডের যুদ্ধচলাকালীন চালে ভুল করে ডাচরা ইংরেজদের বদলে ফ্রান্সের নেপোলিয়ানকেই সাপোর্ট করে বসে। তারা ভেবেছিল নেপোলিয়ানের বাহিনীকে কখনওই ব্রিটিশরা হারাতে সক্ষম হবে না। এর ফল কিন্তু হল বড় সাংঘাতিক। অর্থাৎ নেপোলিয়ানকে পরাস্ত করার পরপরই এদের শায়েস্তা করতে ইংরেজরা এসে সাউথ আফ্রিকার ডাচ অধ্যুষিত জায়গাগুলি প্রায় রাতারাতিই দখল করে নিল। ডাচরা না বুঝতো ইংরেজদের ভাষা, না তাদের আইন কানুন। তাতে আবার আঠারশো তেত্রিশ সালে ইংরেজরা তাদের সব কলোনি থেকে দাসত্ব প্রথা তুলে দেওয়ায় ডাচরা বাধ্য হয়ে সব লটবহর ও খোশা দাসদের নিয়ে নতুন বাসস্থানের খোঁজে উত্তর দিকে হাঁটা দেয়। ইতিহাসে যার নাম 'গ্রেট ট্রেক।' আমরা যে ট্রেকিং করতে যাওয়া বলি সেটি এই ডাচ শব্দ থেকেই এসেছে যার মানে 'ট্যু ট্রাভেল।' উত্তরের এই জায়গাগুলি ছিল স্থানীয় 'জুলু' উপজাতিদের বাস। কিছু দিনের মধ্যেই ডাচরা প্রায় হাজার তিনেক জুলুকে বন্দুকের ঘায়ে খতম করে ও বাদবাকিদের দাস বানিয়ে তাদের জায়গাতেই পাকাপাকিভাবে বসতি স্থাপন কর। এই ভাবেই আজকের সাউথ আফ্রিকার দক্ষিণদিক ব্রিটিশ ও উত্তরটি ডাচদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেল।

"I contend that we (The English) are the first race in the world and the more of the world we inhab it, the better it is for the human race." ইংলিশম্যানদের এই অহংকারই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাদের গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল আর সেই মান রাখতে তারা অনেক ভালো কাজও করেছিলেন। আজও পৃথিবীর মেধাবী ছেলেমেয়েদের ফ্রিতে অক্সফোর্ড পড়ার জন্য যে বিখ্যাত 'রোডস' স্কলারশিপটি দেওয়া হয় সেটি এনারই অবদান। আজকের জিম্বাবুয়ে দেশটিও ওঁর নামেই ছিল তখন তাকে বলা হত 'রোডেশিয়া'। এই অহংকারের জোরেই রোডস ঠিক করে ফেললেন ইজিপ্ট তো ব্রিটিশ কলোনি আছে তাই একেবারে দক্ষিণের কেপটাউইন থেকে উত্তরে ইজিপ্ট পর্যন্ত সোজাসুজি ট্রেন লাইন টেনে দিতে পারলেই কেল্লাফতে, তাহলে মধ্যিখানের সব জায়গাই ব্রিটিশদের হাতে চলে আসবে। অগত্যা ডাচরা আর সহ্য করতে না পেরে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়, প্রথমে বোয়ারের যুদ্ধে জিততে পারলেও দ্বিতীয় যুদ্ধে তারা ব্রিটিশদের কাছে হেরে যায়। অবশেষে উনিশশো দুই সালে ডাচরা ব্রিটিশদের সঙ্গে শান্তি স্থাপনা করে দুটি শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় একসঙ্গে মিলেমিশেই এদেশে রাজত্ব করতে থাকে।

কৃষ্ণাঙ্গদের অবস্থা কিন্তু যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই উপরন্তু উনিশশো আটচল্লিশ সালে তার সঙ্গে যোগ হল অ্যাপারটহাইটের যাকে বলে অ্যাপারটেন্স। সাদা ও কালোদের জায়গা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল। তারা এক বাসে চড়তে পারবে না এমন কি এক সীবিচ বা স্কুল রেস্টুরেন্টেও ঢুকতে পারবে না। এর প্রতিবাদে যে কৃষ্ণাঙ্গরা সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন 'নেলসন ম্যান্ডেলা', 'টমবো', 'সিসুলু' ও 'সোবুকোয়ে'র মত লোকজন যারা একত্রে বলে উঠেছিলেন - 'There is only one race, The human race'। রোভেনিয়া ট্রায়ালের পর এদের প্রায় সবাইকেই দ্বীপান্তর অর্থাৎ কেপটাউনের কাছে রবেন আইল্যান্ডে চালান করে দেওয়া হয়। দীর্ঘ সাতাশ বছর সশ্রম কারাদন্ডের

মধ্যে এই রবেন আইল্যান্ডেই ম্যান্ডেলা আঠারো বছর কাটিয়েছিলেন। অবশেষে আন্তর্জাতিক চাপে পড়ে ও এদেশের প্রেসিডেন্ট ডিক্লার্কের সহায়তায় উনিনশো নব্বই সালে ম্যান্ডেলা মুক্তি পান ও তিরানব্বই সালে এনাদের দুজনকেই যুগ্মভাবে নোবেল শান্তি পুরষ্কার দেওয়া হয়।

কালো চামড়াদের জ্ঞাতার্থে

স্বাধীনতা হাতে আসার পরও এত বছরের অমানুষিক অত্যাচারের বদলা নিতে কৃষ্ণাঙ্গরা যে ধেয়ে আসেনি তার প্রধান কারণ শুধু ম্যান্ডেলার শান্তির বাণী নয়, তার সঙ্গে আর একজনও যোগ দিয়েছিলেন তিনি হলেন আর্চবিশপ 'ডেসমন্ড টুটু'। যে ভাবেই হোক লোকজনকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন - না রক্তের বদলে রক্ত নয়, শত্রুদের ক্ষমা করে তাদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দাও। ম্যান্ডেলা বলেছিলেন - "If you want to make peace with your enemy you have to work with your enemy. Then he becomes your partner" উনিনশো চুরানব্বই সালে কৃষ্ণাঙ্গরা প্রথম ভোটাধিকার পেয়ে ম্যান্ডেলাকেই প্রেসিডেন্টের পদে বসায় আর তার পাঁচ বছর পর তিনি নিজেই সে পদ থেকে সরে যান। দুহাজার তেরো সালের ডিসেম্বরে নেলসন ম্যান্ডেলার মৃত্যু হয়। তাঁর লেখা 'লং ওয়াক ট্যু ফ্রিডম' বইটি আজ পৃথিবী বিখ্যাত।

জানলার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে আমাদের প্লেনযাত্রাও প্রায় শেষ হবার মুখে। জোহানসবার্গে নেমে কাস্টমস-এর ঝামেলা মিটিয়ে ফেলেই আর একটি প্লেনে করে সোজা রওনা হলাম কেপ টাউনের দিকে। কথাতেই আছে অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। এয়ারপোর্টে নেমে বুকে ব্যাজ লাগানো দুটি মেয়েকে দেখে তাদের ভাষাতেই সম্ভাষণ করে বললাম 'মলো' অর্থাৎ হ্যালো। এই শব্দটি জানার একটি সুবিধা হল শুধু হ্যালো নয়, এটি সুপ্রভাত থেকে শুভরাত্রি সব ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায়। ইংরেজদের মত বারবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কখনও গুড মর্নিং বা কখনও গুড আফটারনুনের ঝামেলায় পড়তে হয় না। মেয়েদুটি আমার ভুল সংশোধন করে বলল একজনকে সম্ভাষণ করলে বলবে 'মলো' কিন্তু আমরা একের অধিক আছি তাই তোমাকে বলতে হবে 'মলোয়েনি।' একজনকে কেমন আছ জিজ্ঞাসা করলে বলব 'উনজানি' আর একের অধিক হলেই সেটি হয়ে যাবে 'নিনজানি।' এই ভাষায় দুইয়ের কোন স্থান নেই অর্থাৎ একের অধিক হলেই সেটি বহু। এই ইতালিয়ানদের মতো 'নিনি' ঝংকারগুলি হয়তো কানে মধুরই ঠেকত যদি না তার সঙ্গে এই অদ্ভুত ক্লিক ক্লিক শব্দগুলি যুক্ত হত। এইভাবে কথা বলার কারণ, একসময় খোশারা ছিল শিকারীর জাত তাই এই অদ্ভুত শব্দগুলি শুনলে জানোয়াররা সচেতন হত না, ভাবতো তাদেরই জাতভাইরা আশে পাশে ঘুরছে সেই কারণে শিকার ধরতে সুবিধা হত। সাধে কি ডাচরা এদের নাম দিয়েছিল 'হটেনটট!' জিভ উল্টিয়ে সারাক্ষণই যেন মুখ দিয়ে ঘোড়ার খুরের মত আওয়াজ করে যাচ্ছে।

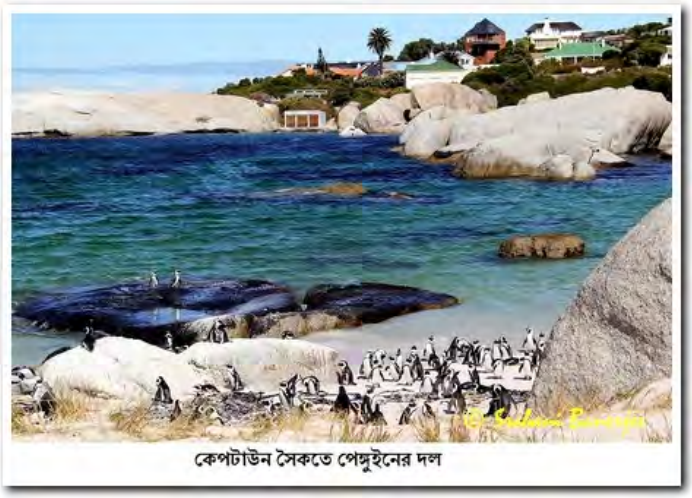

কেপটাউন সৈকতে পেঙ্গুইনের দল

বেলা তিনটের আগে হোটেলের ঘর তৈরি হবেনা বলে বাস ড্রাইভার আমাদের সারা কেপটাউনই ঘোরাতে শুরু করল। চারদিকে পাহাড়, রাস্তার দুধারে তালগাছের সারি, সমুদ্র ও সাজানো বাড়িঘর নিয়ে এটি এককথায় ভারি সুন্দর শহর। এক সময় আমাদের পেঙ্গুইন দেখানোর জন্য বাসটা সোজা সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়াল। এদের সাইজ খুব বড় নয় কিন্তু চালচলন দেখার মত। কখনও দেখে মনে হয় তারা একসঙ্গে বসে জটলা করছে আর কখনও বা যেন দুই বন্ধুতে দিব্যি গল্প করতে করতে হেঁটে চলেছে। সাইজে ছোট হলে কী হবে ক্ষমতার দিক থেকে একেবারে ধানি লঙ্কা। সমুদ্রে কুড়ি কিলোমিটার বেগে সাঁতরে মাছ ধরা প্র্যাকটিস থাকায় কাছে গিয়ে ছবি তুলতে গেলে সেই একই স্পিডে লোকজনের দিকে তেড়ে আসছে। অগত্যা মানে মানে সরে পড়লাম। এখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আমাদের বাস পাহাড় ঘেঁষে দুধারে আঙুরখেতের পাশ দিয়ে চলতে শুরু করল। নেপোলিয়ানকে যুদ্ধে হারিয়ে ব্রিটিশরা যখন তাকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপ চালান করে দেয়, তিনিও নাকি এই কেপটাউনের 'কনস্টানটিয়া' ওয়াইন ছাড়া আর কিছু মুখে তুলতে পারতেন না। যতই হোক নেপোলিয়ান বলে কথা! যে সে বন্দী তো নয় যে যা জুটবে তাই সোনামুখ করে পান করবে। বাইজান্টাইন সম্রাট কনস্টান্টিনের মেয়ের নামে পরিচিত এই ওয়াইনটিকে তিনি ফরাসী ওয়াইনের থেকেও বেশি পছন্দ করতেন বলে ফরাসীরা নাকি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। এই ভাবেই একসময় ঘুরতে ঘুরতে আমাদের বাস শহরে ঢুকে পড়ল। এই ঝকঝকে জমজমাটি রাস্তাগুলি দেখলে কে বলবে এগুলো একসময় সমুদ্রের তলায় ছিল! ডাচদের এই ব্যাপারে জুড়ি নেই তারা সমুদ্রে বালি ফেলে রাস্তা তৈরি করে শহরকে সুন্দর করে সাজায়। এখানকার লংস্ট্রিটকে আমাদের পার্কস্ট্রিটের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে কারণ সন্ধ্যা হলেই এখানে লোকজন পার্টির আনন্দে মেতে ওঠে। পার্টি বলে পার্টি! লংস্ট্রিটের কাছে আমাদের পার্কস্ট্রিট নিতান্তই শিশু। রেস্টুরেন্ট বা বার তো ছেড়েই দিন মায় রাস্তাতেও তারা যেভাবে জামা উড়িয়ে নেচে নেচে হল্লা করছিল দেখলে দস্তুর মত হৃৎকম্প হয়।

বেলা দুটো নাগাদ বাস ভিক্টোরিয়া হারবারে গিয়ে হাজির হল যাতে মধ্যাহ্নভোজনটি আমরা সেখানেই সেরে ফেলতে পারি। গাইড মহম্মদ খান ওরফে M.K. আমাদের সাবধান করে দিয়ে বলল তোমরা আমেরিকানরা যেন ভাল ভালো ভালো সামুদ্রিক মাছ বা চিংড়ি দেখে আনন্দে উদ্বেল হয়ে 'ও মাই গড, সো চিপ সো চিপ' বলে চিল্লিয়ে উঠো না। মনে রেখো এটা আমাদের দেশ আর এখানেই আমাদের থাকতে হবে। জলের ধারে ভিক্টোরিয়া হারবারটি এতটাই জমজমাট যে দেখলে মনে হয় সারাক্ষণই যেন মেলা বসেছে। কেউ রঙবেরং-এর জামাকাপড় পরে বাজনা বাজাচ্ছে, কেউ কেউ বা সেই তালে তাল মিলিয়ে নেচে যাচ্ছে। কোনও কোনও বাচ্চা দেখি গালে সিংহ এঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবশেষে একটি সীফুড রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাবার অর্ডার দেওয়ার সময়ে সাবধানবাণীর মর্মটি বুঝলাম তা না হলে আমিও হয়তো 'চিপ চিপ' বলে গগন কাঁপাতাম। এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি সেই প্রথমদিনটি থেকে তারপর যে বারোদিন আমরা দেশটিতে ছিলাম একদিনের জন্যও খারাপ রান্না বা খাবার খেয়েছি বলে মনে করতে পারিনি। গাইড আমাদের হেসে হেসে বলল – চিনে, ভারতীয়, ইন্দোনেশিয়ান, ডাচ, ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান ও লোকাল খোশাদের কম্বিনেশনে আমাদের দেশে যে অনবদ্য খাবারগুলি সৃষ্টি হয়েছে তাতে আর আমাদের আলাদা করে ফ্যিউশন কুকিং শিখতে হয়নি।

পরের দিন সকাল বেলা গেলাম ইউনেসকো হেরিটেজ সাইট সেই বিখ্যাত ক্রীস্টেনবস বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখতে। ডাচরা এই বাগানটি প্রথমে তৈরি করলেও পরে এটিকে সেই সেই বিখ্যাত ইংলিশম্যান রোডস কিনে নিয়ে আরও সুন্দর করে সাজান। টেবিল মাউন্টেনের ঢালে ধাপে ধাপে

অভিনব গাছ ও ফুল দিয়ে সাজানো বাগানটি দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। আমাদের গাইড নিজেকে 'রেনবো মিশ' বলে পরিচয় দিল কারণ তার শরীরে নাকি ডাচ, মালয়েশিয়ান, কাশ্মিরী মুসলমান ও স্থানীয় খোশাদের রক্ত বইছে। বাস্তবিক এদেশের মাটিতে পা দেবার পর থেকেই সাদা, কালো ও বাদামীদের সংমিশ্রণে এতরকম চেহারা বা রং-এর শেড চোখে পড়েছে যে এশিয়ান পেন্টসও বোধহয় হার মানতে বাধ্য হবে। মিশ জানিয়ে দিল কেপটাউনে অনেক মসজিদ থাকলেও এখানকার মুসলমানরা আদৌ গোঁড়া নয় আর তাদের মেয়েরাও রাস্তায় বোরখা পরে ঘোরে না।

ক্রীস্টেনবস বোটানিক্যাল গার্ডেন

সেদিন সন্ধ্যাবেলার সবথেকে স্মরণীয় ঘটনা ছিল কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত লাংগা টাউনশিপের 'লেলাপা' রেস্টুরেন্টে খেতে যাওয়া। বহুবছর আগে এই রেস্টুরেন্টের মালিক 'পোংগোজি' হোটেলে ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে একটি কাগজ কুড়িয়ে পায়, যেটা আগের রাত্রে সেখানে থাকা সাদা দম্পতির রেস্টুরেন্টে সামান্য ওয়াইন ও চীজ খাওয়ার রসিদ। দামটা দেখে সে অত্যন্ত চমকে ওঠে। এটা কী করে সম্ভব? সারা মাস হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে সে যে মাইনেটা পায় সেটা কিনা সামান্য একটু ওয়াইন আর চীজের দাম? স্বাধীনতা পাওয়ার পর তাই সে নিজের এই ছোট্ট বাড়িটিতেই এই রেস্টুরেন্টটি খোলে আর তার সঙ্গে যোগ করে আফ্রিকান নাচ, গান ও বাজনা। একটি কালো ছেলে যেভাবে মাথা নীচে ও বডি ওপরে করে অর্থাৎ আপসাইড ডাউন হয়ে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল যে অনেকেই দেখলাম খাওয়া ভুলে সেই দিকেই পিটপিট করে চেয়ে আছে। ড্রাম পেটানোর ব্যাপারেও আফ্রিকানদের কোনও জুড়ি নেই। এ এমনই এক ছন্দ কচ্ছপও বোধহয় কোমর দোলাতে বাধ্য হবে। ব্যুফেতে অন্যান্য খাবারের সঙ্গে 'প্যাপও' সেখানে বিদ্যমান কারণ আমাদের ভাতের মত এই নুন দিয়ে ভুট্টা বাটাটাই এদের প্রধান খাদ্য। এই ভুট্টার সঙ্গে আবার আলু মেশালে তার নাম হয়ে যায় উমুসা। ভারতীয়দের কাছ থেকে শিখছে কিনা জানি না একটি খাবার খেয়ে মনে হল পুরোপুরি বাঙালি ঘুগনি খাচ্ছি আর টমেটো বাঁধাকপির কচুম্বাটিও আমাদের বাঁধাকপির ঘন্টেরই নামান্তর।

পরের দিন সদলবলে কেবিলকার নিয়ে টেবিল মাউন্টেনের ওপরে উঠলাম। নীচ থেকে দেখলে মনে হয় যেন এক হাজার মিটার উচ্চতায় একটি বড়সড় টেবিল দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় উঠে সারা কেপটাউন, রবেন আইল্যান্ড ও চারিদিকে নীল সমুদ্র দেখে মনে হচ্ছিল ঘন্টার পর ঘন্টা ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকি।

বোক্যাপ

কেপটাউনে অত্যন্ত চড়া রঙবেরঙের বাড়িতে ভর্তি একটি জায়গার নাম 'বোক্যাপ'। এই রঙের কারণ হল উনিনশো ছেষট্টি সালে মুসলমান অধ্যুষিত এই জায়গাটিকে সরকার থেকে নির্দেশ দেওয়া হয় হেরিটেজ সাইটের কাছে বলে তারা যেন বাড়িতে সাদা রং করে। রাগের চোটে মুসলমানেরা সাদা বাদ দিয়ে পৃথিবীতে যতরকম উগ্র রং আছে সব দিয়েই বাড়িগুলি রঙ করে নেয় যা কিনা এখন একটি ট্যুরিস্ট স্পট। এই তল্লাটের 'ডিস্ট্রিক্ট সিক্স' মিউজিয়ামটিও একটি দর্শনীয় স্থানের মধ্যে পড়ে। প্রায় একই সময়ে কালো ও এশিয়ান অধ্যুষিত এই জায়গাটিতে সাদারা এসে প্রায় ষাট হাজার বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়। এর লোকেশনটা দুর্ধর্ষ তাই সাদা ছাড়া অন্য চামড়ার লোকেদের সেখানে কোনও স্থান নেই, কারণ সে সময়ে যা কিছু ভালো তা সবই ছিল শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত। মিউজিয়ামে রাখা একটি 'ইউরোপিয়ান ওনলি' লেখা বেঞ্চে আমায় বসতে দেখে মজা পেয়ে আমাদের গ্রুপেরই একটি সাদা ছেলে আমার বেশ কয়েকটি ছবি তুলে ফেলল। এখনও ভিক্টোরিয়া স্ট্রিটে নিদর্শনস্বরূপ হোয়াইট ওনলি বেঞ্চ দেখতে পাবেন, অর্থাৎ মাত্র পঁচিশ বছর আগেও সাউথ আফ্রিকা কেমন ছিল যাতে লোকজন এসে দেখতে পারে। পরের দিন দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা এখান থেকে বারো কিলোমিটার দূরে 'রবেন আইল্যান্ড' যাবার লঞ্চ ধরলাম। নেলসন ম্যান্ডেলার দীর্ঘ সাতাশ বছর জেলে কাটানোর মধ্যে আঠারো বছর এখানেই দ্বীপান্তরেই কাটে। সাংঘাতিক উত্তাল সমুদ্র তাতে আবার দেখলাম বেশ কিছু তিমিও ঘুরে বেড়াচ্ছে। রবেন আইল্যান্ডে পৌঁছে ম্যান্ডেলার ঘরের সাইজ দেখেও হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। অত্যন্ত সরু এক ফালি ঘরে মাটিতে চটের বিছানা আর তার পাশে প্রাতঃকৃত্য সারার জন্য একটি বালতির ব্যবস্থা। প্রথম দিকে ওঁকে চেনে বেঁধেই রাখা হত আর প্রতিবাদ করলে জুটতো চাবুকের আঘাত। সেদিন সবথেকে স্মরণীয় ঘটনা হল একদা ম্যান্ডেলার প্রিজন গার্ড 'ক্রিস্টো ব্র্যান্ড' এর সঙ্গে আলাপ হওয়া। তাই আমার কাছে তখনকার ঘটনাগুলি না শুনে আসুন ক্রিস্টোর মুখ থেকেই পুরো ব্যাপারটা শোনা যাক।

একদিন দেখি লোকটা সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পরেও দিব্যি গুন গুন করে গান গাইছে। কি গান জিজ্ঞাসা করাতে বলল 'এটাকে বলে জ্যাজ, আমেরিকার কালো ক্রীতদাসরা এই গান গাইতো'। তার কয়েকদিন পরেই দেখি টিমটিমে আলোয় কী সব বই পড়ছে। আমায় বলল 'এগুলো মহাত্মা গান্ধীর লেখা বই আর এগুলো না থাকলে আমি বোধহয় এতদিনে পাগলই হয়ে যেতাম'। এদিকে আমি খালি ভাবতাম এত পাজি লোক অথচ দ্যাখ চালচলনে কিছুই বোঝার উপায় নেই। এইভাবেই কী করে জানি না নিজেদের অজান্তেই আমরা এক সময়ে বন্ধু হয়ে গেলাম। বিয়ের পর আমার বউয়ের হাতে তৈরি কেকও ওঁকে লুকিয়ে এনে খাইয়েছিলাম। একবার দেখি ওঁর দ্বিতীয় স্ত্রী 'উইনি' প্রচন্ড গরমের মধ্যেও একটি মোটা কম্বল জড়িয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। মধ্যিখানে কাঁচের ব্যবধান থাকায় ওঁরা একে অন্যকে ছুঁয়ে দেখতে পারতেন না। একসময় খেয়াল করলাম উইনি ম্যান্ডেলা আমাকে ইশারায় কম্বলের ভেতরটা দেখতে বলছেন। ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে দেখি সেখানে একটা খুব ছোট বাচ্চা ঘুমিয়ে আছে। আমি তো দেখে তাজ্জব। আমাকে কাকুতি মিনতি করলেন এক মুহূর্তের জন্য হলেও তাদের প্রথম নাতিটিকে আমি যেন একবার ম্যান্ডেলার হাতে তুলে দিই। ধরা পড়লে আমার কঠিন শাস্তি হবে তবুও চোখের জল দেখে থাকতে না পেরে একসময় ছোঁ মেরে বাচ্চাটিকে তুলে ম্যান্ডেলার ঘরে ঢুকে তার হাতে দিয়ে দিলাম। উনি মিনিট খানেকেই মাত্র বাচ্চাটিকে ধরতে পেরেছিলেন কারণ তার থেকে বেশিক্ষণ দেওয়ার সাহস আমার ছিলনা। শিশুটিকে কোলে নিয়ে ওঁর কান্না দেখে কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম! পরে আমায় বলেছিলেন – জানো তো আমি আমার নিজের

বাচ্চাদের কোনও দিন বড় হতে দেখিনি, তাই নাতিটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণের জন্যও আমার সেই সাধ মিটেছিল।
রবেন আইল্যান্ডের পর অন্য দুটি জেলে ম্যান্ডেলার আরও ন-বছর কাটে আর আমিও তার পিছু পিছু ওঁর গার্ড হয়ে যাই। শেষ কয়েক বছর ওঁকে গৃহবন্দী করে রাখা হয় তখন আমরা দুজনে একসঙ্গে টেনিসও খেলতাম। প্রথমদিন রান্নাঘরে ঢুকে চিৎকার করে বলেছিলেন - তোমাদের কত টাকা তোমরা রান্নাঘরেও টেলিভিশন রাখো। ভুল ভাঙ্গিয়ে বলেছিলাম এটা টিভি নয়, একে বলে মাইক্রোওয়েভ। এ দেশের প্রেসিডেন্ট হবার পর ম্যান্ডেলা আমার ছেলের চাকরি করে দেন আর সেই ছেলের যখন মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়, দেখি প্রেসিডেন্ট নিজে এসে আমার ছোট্ট বাড়িটার দরজায় ধাক্কা দিচ্ছেন। সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন - 'আমার প্রথম সন্তানটি যখন মারা যায় তখন জেলখানা থেকে সামান্য কয়েক ঘন্টার ছুটি চেয়েছিলাম যাতে একবার শেষ দেখা দেখতে পারি কিন্তু সে সময়টুকুও আমায় কেউ দেয়নি। আমি তাই নিজে এসেছি তোমার সঙ্গে দেখা করতে কারণ সন্তান হারানোর শোক সব রঙের মানুষের বুকেই সমানভাবে বাজে।' আমার সন্তানের মৃত্যুতে আনন্দ পেয়ে সেদিন ওয়ার্ডেনটি হেসে হেসে বলেছিল - মিঃ ম্যান্ডেলা তোমাকে একটা দারুণ সুখবর দিতে এসেছি তোমার প্রথম সন্তানটি গতকাল মারা গেছে, তাই যদি কোনওদিন জেল থেকে ছাড়া পাও তাহলে একটা বাচ্চাকে অন্তত কম খেতে দিতে হবে। সেই দুঃখের দিনেও চেনে বাঁধা অবস্থায় চোখের জল ফেলতে ফেলতে রবেন আইল্যান্ডের চুনাপাথরের খনিতে আমায় সারাদিন পাথর ভাঙতে হয়েছে।'

একদা নেলসন ম্যান্ডেলার কারারক্ষী ক্রিস্টো ব্র্যান্ড

আজ অনেকেই ম্যান্ডেলাকে গান্ধীজির সঙ্গে তুলনা করেন। গান্ধীজির প্রতি অসীম শ্রদ্ধা থাকলেও ওঁর সত্যাগ্রহকে ম্যান্ডেলা কিন্তু সব সময় মেনে নিতে পারেন নি কারণ দুজনের পরিস্থিতি ঠিক এক ছিল না। সাউথ আফ্রিকাতে একুশ বছর থাকাকালীন গান্ধী যে চারবার জেলের মুখ দেখেছিলেন তার মধ্যে একবার সাত মাসের বাদ দিলে কোনটাই সশ্রম কারাদন্ড ছিল না, উপরন্তু তাদের মেয়াদও ছিল মাত্র মাস দুয়েকের। যে দেশ একসময় শুধুমাত্র গায়ের রঙের মাপকাঠিতেই মানুষ বিচার করত তাদের কাছে গান্ধী ছিলেন বাদামী অর্থাৎ ওঁর স্টেটাস ছিল সাদা কালোর মাঝামাঝি। সে সুবাদেই কালো মানুষগুলির ধারে কাছে নৃশংসতাও তাকে বা অন্য ভারতীয়দের সহ্য করতে হয় নি। ভাবতে অবাক লাগে গান্ধীজী নিজেও কিন্তু এই গায়ের রঙ এর থিয়রিতেই বিশ্বাসী ছিলেন। কালোদের সম্বন্ধে লিখেছিলেন - "Kaffirs are as a rule uncivilized the convicts even more so. They

নেলসন ম্যান্ডেলার কারাকক্ষ

are troublesome, very dirty and live almost like animals." সাদাদের সম্বন্ধে উনিনশো তিন সালের চব্বিশে সেপ্টেম্বরে লেখা গান্ধীজীর উক্তিটি একটু খেয়াল করুন - "We believe also that the white race of South Africa should be predominating race." আমেরিকাতেও একসময় কালো ক্রীতদাসদের ওপর যে নির্মম অত্যাচার করা হয় তার কিছুটা বিবরণ 'আঙ্কেল টমস কেবিন' বইটি থেকে পাই।
জেলেও ভারতীয়দের থাকা খাওয়া ছিল কালোদের তুলনায় অনেক উন্নত। দিনের পর দিন পিঠে চাবুক, পায়ে শিকল, সারাদিন অসহ্য গরমে পাথর ভাঙা বা ভাতের ফ্যান খেয়েও গান্ধীজীকে বছরের পর বছর জেলে কাটাতে হয় নি। তাই কৃষ্ণাঙ্গরা যখন এই অত্যাচার ও অবিচার সহ্য করতে করতে এক সময়ে ক্ষেপে উঠেছিল তখন ম্যান্ডেলা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন --- "When the waters start boiling it is foolish to turn off the heat." উনি মনে করতেন হাতে কিছুটা স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত অহিংসার বাণী প্রচার করা উচিত নয়। স্বাধীনতা পাবার পরই তিনি গান্ধীজীর মতে মত দিয়ে দেশের লোককে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন - না প্রতিহিংসা নয়, কারণ ' An eye for an eye will make the whole world blind.'

রবেন আইল্যান্ডে চুনাপাথরের খনি

পরের দিন গিয়েছিলাম কেপটাউন থেকে পঁচাত্তর কিলোমিটার দূরে ওয়াইন ল্যান্ড ট্যুরে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে আঙুরের চাষ আর তার কাছেই এক একটি ওয়াইন তৈরির কারখানা। আমাদের প্রত্যেকের সামনেই রাখা ছিল চারটে করে ওয়াইনের গ্লাস। তাতে কিছুটা করে ওয়াইন ঢেলে সামনে একটি করে চকোলেট সাজিয়ে গাইড বলল, বাঁদিক থেকে শুরু করতে হবে। প্রতিটি ওয়াইন পান করার আগে তার সামনে রাখা চকোলেটটিকে ভালো করে শুঁকে না নিলে ওয়াইনের আস্বাদই নাকি অনুভব করা যাবে না। আমার পাশে বসা ছেলেটির চকোলেটে এ্যালার্জি শুনে অত্যন্ত খুশি হয়ে নিজের সঙ্গে তারটিও স্পিডে গলাদ্ধকরণ করেছিলাম, এমন সময় গাইড একেবারে হাঁ হাঁ রবে আমার দিকে তেড়ে এল। আমি নাকি বাঁ ডান এর সিকোয়েন্স ফলো না করেই ভুলভাল চকোলেট শুঁকে ভুল ওয়াইন পান করছি। এরও যে এতরকমের নিয়ম আছে তা কে

ওয়াইন ল্যান্ড-এ

জানত!

বিকেলে কেপটাউনের একটি বস্তির স্কুল দেখতে যাই। গভর্মেন্ট থেকে বস্তিগুলিকে ভেঙে সেই জায়গায় তাদের থাকার জন্য সুন্দর ফ্ল্যাট তৈরি করে দিচ্ছে। বাচ্চারা দেখলাম পোলারয়েড কামেরাতে তোলা নিজেদের ছবিগুলি হাতে পেয়ে একেবারে আনন্দে লাফিয়ে উঠল। তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দেওয়াতে কেউ কেউ নিজেদের টিফিনের থেকেও আমাকে ভাগ দিতে এসেছিল। একজন সাদা টিচার দেখতে পেয়ে হেসে তাদের সরিয়ে নিয়ে গেল। হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন, এই গরীব কালো বাচ্চাগুলিকে কিন্তু সাদারাই পড়ানো বা গান-বাজনা শেখানোর ভার নিয়েছে। পঁচিশ বছরে কী অসামান্য পরিবর্তন! বাচ্চারা যে ভাবে তাদের সাদা টিচারদের জড়িয়ে ধরে বসেছিল তাতে আর যাই হোক সেটিকে আমার অভিনয় বলে মনে হয় নি।

শেষের দিন সকালেই 'কেপ অফ গুড হোপ' এর দিকে রওনা হলাম। এখানে কিছুক্ষন কাটিয়ে তারপর জোহানাসবার্গের প্লেন ধরার পালা। এ হল সেই বিখ্যাত 'কেপ অফ গুড হোপ' যা কিনা ভাস্কো-ডা-গামার দৌলতে সেই স্কুলে পড়ার সময় থেকেই আমাদের সবার জানা। এটি এখন ন্যাশনাল পার্কের মধ্যেই পড়ে যেখানে অজস্র বেবুন ও অস্ট্রিচ দেখা যায়। সারা সাউথ আফ্রিকা জুড়েই বড় বড় কারুকার্য করা অস্ট্রিচের ডিম বিক্রি হয় যা লোকে বাড়িতে সাজিয়ে রাখে। আফ্রিকার সবথেকে দক্ষিণ প্রান্তটি পাহাড় সমুদ্র নিয়ে যত সুন্দরই হোক হাওয়ার ঠেলায় সেখানে বেশীক্ষণ দাঁড়ায় কার সাধ্যি! আমাদের গ্রুপের দুটি আমেরিকান ছেলে দেখলাম তাদের রোগা বন্ধুটিকে একেবারে বগলদাবা করে নিয়েই হাঁটছে তাদের ভয় তা না হলে সে নাকি নিমেষের মধ্যেই উড়ে গিয়ে আটলান্টিক ওশানে পড়বে। ট্রাম নিয়ে টং-এ চেপে দেখি সেখানে বড় বড় ভাস্কো-ডা-গামার ছবির সঙ্গে এখান থেকে তিনি কিভাবে ভারতবর্ষ গিয়েছিলেন তার বর্ণনাতেই ভরা।

কেপ অফ গুড হোপ

এখান থেকেই সোজা এয়ারপোর্ট গিয়ে জোহানাসবার্গের প্লেন ধরলাম। গাইড যাত্রাপথেই এই শহরটির ক্রাইম সম্বন্ধে সাবধান করে দিল। আর সেই কারণেই নাকি অফিসগুলো একটু দূরে সান্টন সিটিতে চলে গেছে। আমাদের হোটেলও সেখানেই। গাইড মজা করে বলল এটাই পৃথিবীর একমাত্র শহর যেখানে ডাকাতরা লুটের টাকা গাড়িতে তোলার আগেই অন্য ডাকাতের দল সেগুলিকে কেড়ে নিয়ে চম্পট দেয়। সান্টন সিটিতে পৌঁছে মনে হল কে বলবে এর এত কাছে জোবার্গ! দোকানপাট, অফিস, হোটেল সব কিছু নিয়ে এ এক রীতিমত বড়লোকের জায়গা। হোটেলের সামনেই ম্যান্ডেলা স্কোয়ারে একটি ছ-মিটার উঁচু ম্যান্ডেলার ব্রোঞ্জ স্ট্যাচু। সেটিকে ঘিরে আলো, ফোয়ারা অজস্র নামীদামী রেস্টুরেন্ট ও একটি মাথাঘোরানো শপিং মল। সেটি শুধু সাইজে নয় তার বাহার দেখলেও চোখ ঝলসায়। ভেতরে যারা বাজার করছেন তাদের দামী সাজ পোষাকও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যদিও দেখলাম তেনারা বেশির ভাগই সাদা কিংবা এশিয়ান। অনেক উন্নতি হলেও এদেশে এখনও সাদা কালোর তফাতটা চোখে পড়ার মত। নামীদামী রেস্টুরেন্টে গেলে দেখবেন যারা খাচ্ছে তারা প্রায় সবাই শ্বেতাঙ্গ আর যারা সার্ভ করছে তারা বেশির ভাগই কৃষ্ণাঙ্গ।

ম্যান্ডেলা স্কোয়ার - জোহানেসবার্গ

পরের দিন আমরা অ্যাপার্টহাইট (Apartheid) মিউজিয়াম ও সেই কুখ্যাত জেলখানা যেখানে গান্ধী থেকে ম্যান্ডেলা সবাই কাটিয়ে গেছেন সে দুটি দেখতে যাই। চেনে বাঁধা সম্পূর্ণ উলঙ্গ কালো ছেলেমেয়েগুলির ওপর সাদাদের অকথ্য অত্যাচারের ছবি দেখতে দেখতে কেমন যেন মনের দিক দিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছিলাম। কেন জানি না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইহুদীদের জন্য নির্মিত সেই কন্সেনট্রেশান ক্যাম্পগুলির কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। 'কনস্টিটিউসন হিল'এ গিয়ে দেখলাম জেল ও সর্বোচ্চ কোর্ট দুটোই পাশাপাশি। আজকের সাউথ আফ্রিকার নিয়মকানুন অবশ্য খুবই সুন্দর। সর্বোচ্চ কোর্টটি চারিদিক কাচ দিয়ে ঢাকা যাতে ভেতরে কি হচ্ছে লোকজন বাইরে থেকেই দেখতে পারে। আবার যে কোনও সাধারণ মানুষও ট্রায়াল চলাকালীন ভেতরে ঢুকতে পারে। এক সময় এদেশে ভারতীয়দের হাতে পাস নিয়ে ঘুরতে হত যাতে তারা কোথায় যাচ্ছে বা কতদিন সেখানে থাকবে সবকিছু নথিভুক্ত করা যায়। গান্ধীজী তার প্রতিবাদে সব ভারতীয়কেই পাস পুড়িয়ে ফেলতে বলেন তখন সাদারা ক্ষেপে গিয়ে ওঁকে এই ওল্ড কোর্টের জেলে পুরে দেয়। গান্ধীর আবক্ষ মূর্তির পাশেই ওঁর নামে একটি ঘর রাখা আছে যেখানে ওঁর বহু ছবির সঙ্গে ওঁর ব্যবহৃত একজোড়া চটিও দেখা যায়। এক রিপোর্টার লিখেছেন, গান্ধীকে যখন এই সব থেকে কুখ্যাত জেলটিতে আনা হয় তখন ওয়ার্ডেনরা ভেবেছিল কোনও দৈত্যের মতো চেহারা অর্থাৎ 'দারা সিং' টাইপের কাউকে দেখবে। স্কুলবয়ের মত একটি পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চির ছেলেকে জীপ থেকে নামতে দেখে তারা অত্যন্ত হতাশ হয়ে যায়। এখানে কৃষ্ণাঙ্গদের সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর একটি জানলাবিহীন

অন্ধকার ঘরে পুরে দেওয়া হত। তিনমাসে একবার স্নান ও দিনের শেষে খাওয়ার জন্য মিলত ভাতের ফ্যান ও একটুকরো রুটি। তাও দেওয়া হত খোলা শৌচালয়ের সামনে যাতে গন্ধে সেটুকুও পেটে যেতে না পারে। বলা বাহুল্য এই অবস্থায় বেশির ভাগ মানুষই টিকতো না তখন জেলের পাশেই একটি খোলা গর্তে তাদের মৃতদেহগুলিকে ফেলে দেওয়া হত। আমাদের গাইড মহম্মদ বলল তার কাকাকে দশতলা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় আর বডি বাড়িতে আনার সময় দেখে জীবিত অবস্থাতেই তার নখগুলিকে উপড়ে নেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণাঙ্গ মানুষগুলির ওপর এই পাশবিক অত্যাচারের নমুনা দেখতে দেখতে মনে পড়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' কবিতার কয়েকটি লাইন -

'এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে,
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।'

সেদিন বিকেলে এখান থেকে পঞ্চান্ন কিলোমিটার দূরে প্রেটোরিয়া গিয়েছিলাম। এই প্রেটোরিয়া যাওয়ার পথেই ট্রেনে সাদাদের কামরা থেকে গান্ধীজিকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়। প্রেটোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গিয়ে অবশ্য দেখলাম এখন সবাই মিলেমিশেই আছে। এখানে পিটার বলে একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল – তার বাবা মা নাকি এখনও সাদাদের ঠিক বিশ্বাস করে না এবং তাদের ওপরে রাগও যায় নি কিন্তু তারা পিটারকে বলেছে 'তুমি তো অ্যাপার্টহাইট দেখে বড় হওনি তাই তোমরা যারা নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়ে তোমাদের উচিত সব কিছু ভুলে যাওয়া, তোমাদের মধ্যে রকম যেন সাদা কালো বা বাদামীর কোনও ভেদাভেদ না থাকে'।

সে রাত্রে নানা ধরনের খাওয়ার সঙ্গে সবশেষে ছিল এদেশের বিখ্যাত মালভা পুডিং। এর বিশেষত্ব হল গরম কেকটি ওভেন থেকে বার করার সঙ্গে সঙ্গেই তার ওপরে প্রচুর পরিমাণ মাখন ঢেলে দেওয়া হয়। সেটি সারারাত ধরে ভেতরে প্রবেশ করার পর ওপরে ঠান্ডা ক্রিম ও ঘন ক্ষীরের মত দুধ আর বাদাম সহযোগে খাওয়াটাই আদর্শ। বর্ণনাটি শুনেই আন্দাজ করতে পারবেন এটি অখাদ্য হবার সম্ভাবনা খুবই কম।

প্রেটোরিয়া খুব সুন্দর শহর কোনও সন্দেহ নেই কিন্তু জোবার্গ দুধারে বীথির মত গাছ ও একাধিক ফুলে ঢাকা পার্ক নিয়ে হয়তো আরও সুন্দর হতে পারতো যদি না তার সঙ্গে ড্রাগ বা ক্রাইম শব্দগুলি জড়িত থাকত। অভিজাত এলাকাতেও বাড়িগুলি জেলখানার মত উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা যাতে চোরেরা টপকাতে না পারে। ধনী-নির্ধনের মধ্যে এতটাই ফারাক হয়ত এরজন্য দায়ী। জোহানাসবার্গে 'মোয়ো' নামক একটি বিখ্যাত রেস্টুরেন্টে গিয়ে সেখানে নাচগান বা খাবারের বহর দেখে মনে হল এরা এখন বোধহয় ভালোই আছে। রেস্টুরেন্টে মেয়েরা আমাদের সবার মুখেই ফেসপেন্ট করে দিল আর আমাকে অবাক করে দিয়ে একজন বলল তোমাকে চন্দন পড়ানোর মত করে সাজাবো। যদিও সাজানোটি যখন কপাল পেরিয়ে ধীরে ধীরে নাকে চলে এল তখন তাকে নিরস্ত করতে বাধ্য হলাম। এরপরের গন্তব্যস্থল ছিল জোবার্গ থেকে গাড়িতে ছঘন্টা দূরে 'ক্রুগার ন্যাশনাল পার্ক' আর সে রাতটা আমরা সেই জঙ্গলেই ছিলাম। চারদিকে পাহাড় ও গাছপালা নিয়ে যাওয়ার রাস্তাটিও বড় সুন্দর এমন কী অত্যন্ত গ্রাম্য জায়গাতেও রাস্তাঘাটে নোংরা চোখে পড়েনি। কিছু কিছু জায়গায় রাস্তার ধারে আফ্রিকান মেয়েরা ফল থেকে আরম্ভ করে হাতে তৈরি গহনা বা কাঠের পাখি সবই বিক্রি করছে। আমাদের গ্রুপের একটি ছেলে দেখলাম রাস্তার পাকা পেঁপে কিনে ছাড়াতে না পেরে খোশা সমেতই আরাম করে চিবিয়ে খাচ্ছে আর বলছে, 'Look we are not spoiled Americans, we can adjust anywhere in the world.' কথাটা হয়ত পুরোপুরি ভুল নয় কারণ আর এক জায়গায় দেখলাম ওই গরমেও আমেরিকার ডিউক ইউনিভার্সিটির কিছু ছাত্র-ছাত্রী কালো বাচ্চাদের ফ্রি-তে পোলিওর টীকা দিচ্ছে। কিছু কিছু আমেরিকান ছেলেমেয়ে প্রাচুর্যে বড় হয়েও পৃথিবীর যে কোন জায়গাতে গিয়ে মানিয়ে নিতে পারে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের গুজরাটি ভাইরাও অবশ্য পিছিয়ে নেই। একটি গন্ডগ্রামে গিয়ে খেয়াল করলাম হোটেল মোটেল ছেড়ে এক প্যাটেলভাই হার্ডওয়ারের দোকান খুলেছেন।

ক্রুগার পৌঁছাতে পৌঁছাতে বিকেল হয়ে গেল আর সেই যাত্রাপথেই যে পরিমাণ হাতি, গন্ডার, জিরাফ, হরিণ, জেব্রা বা জলা জায়গায় কুমিরের দল দেখলাম যে চোখ প্রায় কপালে ওঠে আর কী! সে রাত্রে আমাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল জঙ্গলের ভেতর খড়ের ছাউনি দেওয়া একটি কুটিরে। ভেতরের ব্যবস্থা অবশ্য আর পাঁচটা নামী দামী হোটেলের মতই। রাত্রে আগুন জ্বালিয়ে মাংস পোড়ানো হল অর্থাৎ 'বারবিকিউ।' চৌহদ্দিটা উঁচু তার দিয়ে ঘেরা, যাতে বন্য জন্তু প্রবেশ করতে না পারে যদিও বাঁদর বেবুনের কাছে সে ব্যবধান তুচ্ছ। তারা দেখলাম দিব্যি গাছে বসেই আমাদের লক্ষ্য করছে।

ি বাইরে আর এখানে তার ঠিক উলটো ব্যবস্থা। হঠাৎ একটি গগনভেদী হুংকারে আমরা সবাই চমকে উঠলাম। গাইড ফিসফিস করে জানাল, আর একটা অন্য প্রাইডের সিংহ এখানে এসেছে আর খুব সম্ভবত এই তিনটি সিংহীর মধ্যে কাউকে তার মনে ধরেছে তাই এই গর্জন। এখনি মারামারি লাগবে বা ডুয়েল দেখতে পাব ভেবে আমি অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম কিন্তু ড্রাইভার আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়াতে রাজি হল না। ফেরার পথে দেখি দুটো বাচ্চা হাতি একে অন্যের ঘাড়ে উঠে খেলছে আর বড় হাতিরা তাদের ঘিরে রেখেছে। জিরাফও দেখলাম জীপ দেখে বিশেষ ভয় পায় না, আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে গলা উঁচু করে পাতা খাচ্ছিল। একটা লেপার্ডকে গাছে বসা অবস্থায় দেখতে পেলেও ক্যামেরা ফোকাস করার আগেই সে অন্তর্ধান করল।

ক্রুগার ন্যাশনাল পার্কে সিংহ পরিবার

ক্যাম্পে ফিরে এসে স্যুটকেস গোছাচ্ছিলাম কারণ একটু পরেই 'জোবার্গে' ফিরতে হবে। এমন সময় দমদম ধাক্কা শুনে তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি সামনে একটি বড়সড় বেবুন দাঁড়িয়ে। ভয়ে ততক্ষণাৎ দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। ওর দোষ ছিল না কারণ আগের দিন সন্ধ্যাবেলা লোকজনের মানা সত্ত্বেও আহা মায়া লাগে বলে তাকে নিজের ভাগ থেকে কিছুটা কেক খেতে দিয়েছিলাম আর খুব সম্ভবত তার স্বাদ ভালো লাগায় সেই খোঁজেই এসেছিল। বাইরে বেরিয়ে শুনলাম একটি মেয়ের হাত থেকে খোলা পেপসির ক্যান কেড়ে নিয়ে একটি বেবুন সেটিকে নাকি তার সামনে বসেই পান করেছে। পরের দিনই আমাদের ফিরে যাওয়ার পালা। সে রাতটি জোবার্গে কাটিয়ে সকালে সেখান থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে পুরোপুরি কৃষ্ণাঙ্গদের শহর সোয়েটোতে গিয়ে হাজির হলাম। এখানকার লোকজন একসময় সোনা ও কয়লাখনিতে কাজ করত। এখানে একই রাস্তায় দুটি নোবেলবিজয়ীর বাড়ি দেখে খুব ভাল লাগল – একজন ম্যান্ডেলা ও অন্যজন টুটু। এই সোয়েটোতেই 'হেকটর পিটারসন' মিউজিয়ামটি দেখতে গিয়ে আর একবার মনে ধাক্কা খেলাম কারণ এখানে যাদেরকে হত্যা করা হয় তারা সবাই স্কুলপড়ুয়া অর্থাৎ একেবারেই কচিকাঁচার দল। ঢোকার মুখেই এক সাংবাদিকের তোলা সেই বিখ্যাত ছবি যেখানে বারো বছরের 'হেক্টরে'র গুলিবিদ্ধ দেহটিকে তার দিদি তুলে নিয়ে আসছে। এই স্কুলের বাচ্চাগুলির অপরাধ ছিল একটাই তারা আফ্রিকান ভাষার পরিবর্তে স্কুলে ইংরেজি শিখতে চেয়েছিল, তাহলে চাকরি পেতে সুবিধা হবে। দুঃখের বিষয় এই অত্যন্ত শান্ত প্রতিবাদের ফলও হল বড় মারাত্মক। উনিনশো ছিয়াত্তর সালের ষোলই জুন সরকারের পক্ষ থেকে লোকজন এসে প্রায় সাতশো অসহায় স্কুলের বাচ্চাকে গুলি করে মেরে ফেলল। একটি মৃত বাচ্চার ছবি দেখে চমকে উঠলাম কারণ তার বয়স ছিল আট।

সাদারা ভয় পেয়েছিল এত নৃশংসতার পর এই কালো মানুষগুলি হয়ত স্বাধীনতা পেয়ে বদলা নিতে ছুটে আসবে কিংবা আতলান্টিকের জলেই তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ভাগ্য ভালো যে মানুষটির অসাধারণ বোঝানোর ক্ষমতার জোরে সেটি হয়নি – তিনি হলেন সেই একমেবাদ্বিতীয়ম

'নেলসন ম্যান্ডেলা' যিনি বলেছিলেন - "Forgiveness Liberates the soul it removes Fear. That is why it is such a powerful weapon."
এদেশে অনেক জায়গাতেই এই লাইনটি আপনাদের চোখে পড়বে - In South Africa we are equal whether you are black, white, green, coloured, Indian, Muslim. We're still together. We made South Africa. বছর পঁচিশ আগেও এ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে ধরণের ঘৃণ্য ও নির্মম ছিল তার থেকে কি পালটানো সম্ভব ? উত্তরে বলব - হয়তো সম্ভব কিংবা নতুন প্রজন্মের কাছে বোধহয় সব পরিবর্তনই সম্ভব।
অতীতের কথা স্মরণে রেখে আমিও এদেশের শ্বেতাঙ্গদের প্রতি কিছুটা বিরূপ মনোভাব নিয়েই এখানকার মাটিতে পা দিয়েছিলাম তবে আনন্দের সঙ্গেই জানাচ্ছি আমাকে কিন্তু হতাশ হতে হয়েছে। এদের ব্যবহারেই আমি মুগ্ধ হয়েছি। যদিও দেখতাম প্রেসিডেন্ট 'জুমা'র নাম শুনলে সব বর্ণের মানুষরাই চটে উঠত কারণ ANC অর্থাৎ আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস নাকি দুর্নীতিতে ভরা। ভেবে লাভ নেই - যে যায় লংকায় সেই হয় রাবণ। সোনা, হিরে, কয়লা বা প্লাটিনামের মত খনিজ সম্পদে ভরপুর দেশটিকে আর যাই হোক বাইরে থেকে দেখলে ঠিক তৃতীয় বিশ্বের কোনও দেশ বলে মনে হয় না। দুটি শ্রেণীর মধ্যে রোজগারের ব্যবধান থাকলেও কৃষ্ণাঙ্গদের বাসস্থানগুলি ঠিক ভারতবর্ষের বস্তি নয়। দুধারে বীথির মত গাছ, ফুলে ঢাকা সুন্দর ঝকঝকে রাস্তাঘাট, সময়ে চলা যানবাহন, সাজানো বাড়িঘর বা পাহাড় সমুদ্র নিয়ে দেশটিকে বাইরে থেকে দেখতে অন্তত খুব ভালোই লাগে।
মনে পড়ে ফেরার দিন ম্যান্ডেলা স্কোয়ারের সামনে মুখে রং করা একটি কালো মেয়ের ছবি তুলতে গিয়েছিলাম কারণ একটি অল্পবয়সী সাদা ছেলে সেই চত্বরেই বসেই বাচ্চাদের গালে ফেসপেন্ট করছিল। ভেবেছিলাম ম্যান্ডেলার মূর্তিটিকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে এই মুখে রং করা কৃষ্ণাঙ্গ বাচ্চাটির ছবি তুলতে পারলে আমি যে সাউথ আফ্রিকায় এসেছি সেটিকে খুব সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতে পারবো। হায়! সে গুড়ে বালি। ক্যামেরা ভালো করে ফোকাস করার আগেই হৈ হৈ করে আরও কিছু গালে রং করা সাদা, কালো ও পাঁচমিশেলি বাচ্চা এসে হাসিমুখে আমার সামনে পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।
সেদিন নিজের ভুল নিজেই বুঝতে পেরে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলাম। হ্যাঁ এটাই তো ঠিক, এটাই যে আজকের নতুন সাউথ আফ্রিকার আদর্শ ছবি। এই রামধনুর রঙে রাঙা একত্রে খেলে বেড়ানো শিশুগুলির হাসিমুখ দেখে ম্যান্ডেলার সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে গিয়েছিল - If people can learn to hate they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. মনে মনে আর একবার সেই মহামানবকে প্রণাম জানিয়ে বিমানবন্দরের দিকে পা বাড়ালাম।

টেবল মাউন্টেন - কেপটাউন

~ *সাউথ আফ্রিকার আরও ছবি* ~

শ্রাবণী ব্যানার্জীর জন্ম ও বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির বাসিন্দা। বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি সঙ্গীতচর্চা ও ইতিহাস পাঠে জড়িয়ে আছে ভালবাসা। কৌতূহল এবং আনন্দের টানেই গত কুড়ি বছর ধরে বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত করে বেড়াচ্ছেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য দেখুন এখানে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

সিকিয়াঝোড়ার অন্দরে

তরুণ প্রামানিক

~ সিকিয়াঝোড়া ইকো পার্কের আরও ছবি ~

ডুয়ার্স মানে গহন বনানীর অপার নির্জনতার কুহকে ঢাকা মায়াবী চুপকথা। ডুয়ার্স মানে ঝকঝকে নীলাকাশের নিচে হলদেটে সবজে চায়ের বাগানের গালিচা আর নীলচে পাহাড়ের হাতছানি। হ্যামিলটনের বাঁশিওয়ালার মতো শান্ত ও স্নিগ্ধ সে। আজ আমার ঝুলিতে গজরাজের পিঠে চেপে বন্য শ্বাপদে ভরা অসূর্যম্পশ্যা অরণ্যের গভীরে অবাধ বিচরণ নয়, বরং এক অন্য অচেনা ডুয়ার্সের গল্প।

হেমন্তের বিদায় বেলায় বাতাসে সদ্য হিমেল ছোয়া। উচাটন মন ছুটে চলেছে দূরের নীলচে পাহাড়ের সিল্যুয়েটে চোখে রেখে সিকিয়াঝোড়া ইকো পার্কের পথে। হাসিমারা স্টেশন থেকে প্রায় ২৫ কিমি দূরে, ভৌগোলিক অবস্থান গত বিচারে এটি আলিপুরদুয়ার জেলার উত্তর পানিয়ালগুড়িতে অবস্থিত। সিকিয়াঝোড়া একটা পাহাড়ি নদী - বক্সা জঙ্গলের পূর্ব দিকে দমনপুর রেঞ্জ আর পশ্চিম দিকে বক্সা টাইগার রিজার্ভ-এর মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে চুপিচুপি বয়ে গেছে জঙ্গলের একদম গভীরে। বেশ কয়েক কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে মিশেছে বালা নদীতে। স্থানীয় মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত একটা সেলফ হেল্প গ্রুপ নদীপথে জঙ্গলের অপার সৌন্দর্য আর অ্যাডভেঞ্চারের মজা নিতে ব্যবস্থা করেছে নৌকা সাফারির। বক্সা জঙ্গলের গভীরে পায়ে হেঁটে যেখানে পৌঁছানো সম্ভব নয়, এই নৌকা বিহারে সেখানে পৌঁছানো যায় অনায়াসে। ডুয়ার্সের আমাজন হিসাবে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করছে রোমাঞ্চকর এই সফর।

টিকিট কেটে নৌকোয় উঠে বসলাম চার বন্ধু মিলে খাঁড়িপথে নৌকা সাফারিতে আমাজনের রোমাঞ্চের স্বাদ নিতে। টলটলে নদীর স্বচ্ছ জল, দুধারে বাদাবনের মতো ঘন বন দুপাশে রেখে এঁকে বেঁকে খাড়ির মত বয়ে গেছে গভীরে। এক অজানা রোমাঞ্চে মন নেচে উঠল। ছলাৎ ছল মাঝির দাঁড় বাওয়ার আওয়াজ সেই রোমাঞ্চকে বাড়িয়ে দিল হাজারগুণ। চারপাশে জারুল, পানিয়াল, চিকরাশ, পানিসাজ, কদম, লালি আর নাম না জানা অজস্র গাছের সারি। খানিক এগোতেই শাপলা পাতায় জলফড়িং-এর লাফালাফি দেখে মনের আতঙ্ক খানিকটা প্রশমিত হল। আসলে অচেনা জায়গায় চেনা জিনিসের দেখা মিললে বাঙালি মনে খানিক স্বস্তি জাগে। নৌকা বামদিকে বাঁক ঘুরতেই সকালের নরম রোদটা হঠাৎ করে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। বুঝতে পারলাম জঙ্গলের আরও গভীরে প্রবেশ করেছি। কুয়াশা জড়ানো শীতের সকালে নদীপথে গহীন জঙ্গলে সূর্য বড় অভিমানী। ঝিমধরা কুয়াশা ঘনিয়েছে নদীর বুক জুড়ে। সেই কুয়াশা পেরিয়ে হিলহিলে হাওয়া এসে নদীর অন্যপাড়ের গল্প বলে। কত রকম পাখির ডাক কানে আসে। কতক বুঝি, বেশির ভাগটাই বুঝিনা। জলে ভেসে থাকা পানকৌড়ি নীরবতা ভঙ্গ করে ঝটপট করে উড়ে যায় দূরে। আস্তে আস্তে বয়ে চলেছি আমরা ক্লোরোফিলের গন্ধ গায়ে মেখে সবুজ, আরও সবুজের গভীরে। মাথার উপর সুনীল শামিয়ানা, নিস্তব্ধ সকালে নিঃসঙ্গ চিল আর একঝাঁক সবজে টিয়ার ওড়াউড়ি। প্রকৃতি এখানে বাতাসের সঙ্গে কথা বলে। মেঘ আর পাখিদের দল সেই বাতাসের ডানায় ভর করে উড়ে বেড়ায়। একটা ভালোলাগার আবেশ গ্রাস করে ক্রমশ। কী নিবিড় শান্তি! অনাবিল সেই প্রশান্তিতে মন ভরে যায়।

সহসা একটা বাঁক ঘুরতেই মনে হল জঙ্গলের বাদাবনের ফাঁক দিয়ে কারা যেন অনেকক্ষণ থেকে অনুসরণ করে চলেছে আমাদের। মুখ তুলে দেখলাম দুপাশ থেকে বড়বড় ডাল নুইয়ে নদীর মাঝখান অবধি চলে এসেছে। সেই ডালের ছোঁয়া বাচিয়ে এঁকেবেঁকে কোনোমতে চলেছি আমরা। গাছের ডালে মাঝে মাঝেই নাকি পেঁচিয়ে থাকে ছোট বড়ো সব সাপ। শুনলাম প্রায়ই নাকি নদীতে জল খেতে আসে বন্য জন্তুরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে। মাঝি আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তর্জনী উঁচিয়ে দেখাল কালকেই একদল দানবাকার দাঁতালের দল সার বেঁধে ঢুকেছে নদীর এপাড়ে। তাদের পায়ের

চাপে ভেজামাটির গর্ত আর আশেপাশের ধ্বংসের ছবি প্রত্যক্ষ করলাম। মুহূর্তেই হাতপা ঠান্ডা হয়ে এলো, মাঝির নির্দেশে সবাই চুপ। শুধু নিঃশ্বাস আর বুকের ধড়ফড়ানির আওয়াজ। স্বচ্ছ নদীর জলের নীচে জলজ অর্কিড সাপের মতো এঁকেবেঁকে ওপরের দিকে উঠছে। দুইহাতে গাছের ডাল, লতাপাতা সরাতে সরাতে মূল নদীর ধারের এক গভীর খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে পাড়ে এসে নৌকা আটকে গেল। এখানে কিছু সময় বিশ্রাম নেবে মাঝিরা। দিনের এই সময়টাতেও এখানে যেন জমাটবাঁধা অন্ধকার। চারধারে বড় বড় গাছ থেকে জটার মতো শিকড় নেমে এসেছে নীচে। জঙ্গলের বুনো গন্ধ নাকে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। মাঝির হাজার বারণ সত্ত্বেও আমার দুই বন্ধু নৌকা থেকে লাফ দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকল ফটোগ্রাফির নেশাতে। নৌকার ওপর বসে বসেই দুচোখ মেলে উপলব্ধি করলাম অসূর্যম্পশ্যা এই জঙ্গলের শিহরণ জাগানো রূপ, মাটির সোঁদা গন্ধ। কানপেতে শুনলাম পাতার মর্মর ধ্বনি, শন শন বেগে বাতাস বওয়ার ছন্দ, ঝিঁঝিঁ পোকাদের বিরামহীন কোরাস।

ঘোর কাটতে বেশি সময় লাগল না। ঊর্ধ্বশ্বাসে হটাৎ ছুটে এল দুই ফটোগ্রাফার বন্ধু। পোশাকে কাদার দাগ, রক্তবর্ণ চোখ, মুখে আতঙ্কের ছাপ। পড়িমরি করে উঠে বসল নৌকাতে। দুহাত দিয়ে কী যেন বলতে চেষ্টা করল মাঝিকে! মাঝি কী বুঝল জানি না। বিদ্যুৎবেগে নৌকা বার করল ওই খাঁড়ি থেকে। একটা চাপা আতঙ্কে তারও ঠোঁট দুটো কাঁপছে। বাকরুদ্ধ আমরা সবাই। খানিকটা ঘোলাটে জলের পথ পিছনে ফেলে রেখে পুনরায় পিছন ফিরে দেখি জঙ্গলের বড় বড় গাছগুলো ঝড়ের মতো জোরে জোরে দুলছে, মনে হল কোনো অতিকায় দানব যেন পিঠ দিয়ে গাছগুলোতে গা ঘসছে। সোল্লাস বৃংহণ পাতায় পাতায় ধাক্কা খেয়ে জঙ্গলের গভীরে হিল্লোল তুলল।
খাঁড়ির থেকে বেরিয়ে আসতে ভয়টা কেটে গেল। জলজঙ্গলের এই অসাধারণ অভিজ্ঞতার স্বাদ-গন্ধ নিয়ে ফিরে এলাম পাড়ে।

~ *সিকিয়াঝোড়া ইকো পার্কের আরও ছবি* ~

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তরুণ প্রামানিক একজন ভ্রমণপিপাসু মানুষ, প্রকৃতির মাঝে খুঁজে বেড়ান জীবনের অপার বিস্ময়কে। সৃষ্টির রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণের বৈচিত্র্যকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন এভাবেই।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

পাটনিটপ - পন্ড অফ দ্য প্রিন্সেস

স্বাতী চক্রবর্তী

"কখন সময় আসে জীবন মুচকি হাসে ঠিক যেন পরে পাওয়া চোদ্দ আনা" - কবীর সুমনের এই গানটাই সেদিন যেন এক লহমায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল আমার কাছে। মার্চ ২০১৫-র রবিবাসরীয় দুপুর। কাকুর ফোন.....বাবা চেঁচাচ্ছে "কাশ্মীর যাবি? পিঙ্কি সন্তোষ যাচ্ছে, সঙ্গে কাকু। রাতের মধ্যে জানাতে হবে।" কতদিনের সাধ! ভাবতে হয় নাকি? আমি তো এক পায়ে খাড়া। আমার বন্ধু ঝুমাও রাজী। এরপর পঁয়তাল্লিশ দিন কীভাবে যেন কেটে গেল। কাশ্মীরের বৃষ্টি, রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি নানারকম মানসিক দ্বন্দ্ব কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লাম গতেবাঁধা প্রাত্যহিকতাকে ফেলে রেখে। সফরসঙ্গী কাকু, খুড়তুতো বোন পিঙ্কি, ভগ্নীপতি সন্তোষ ও ঝুমা এবং আরও কয়েকটি পরিবার। সন্তোষের দাদা স্থানীয় সৌরভ দাস কানুনগোর ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় ২৭ এপ্রিল, ২০১৫।

প্রথমে অমৃতসরে নেমে সকাল থেকে রাত জালিয়ানওয়ালাবাগ, ওয়াঘা বর্ডার, স্বর্ণমন্দির ইত্যাদি চক্কর মেরে রাতে জম্মুগামী ট্রেনে উঠেই ঘুমিয়ে পড়েছি। মেঘের ডাকে ঘুম ভাঙল। মনটা কেমন অস্থির। তবে কি আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ দানা বাঁধতে চলেছে? সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে পুনরায় ঘুমের দেশে। মেঘাচ্ছন্ন সকালে জম্মু পৌঁছলাম। জম্মু স্টেশন থেকে সবে বেরিয়েছি লটবহরসহ, গাড়ির কাছে যাওয়ার আগেই চারদিক থেকে ধেয়ে এল ঝোড়ো হাওয়া আর ধূলিকণার সাদর অভ্যর্থনা। তারপরেই হইহই করে এসে গেল বৃষ্টি। শুরু হল কাশ্মীর ভ্রমণ। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের গাড়ি পাহাড়ি পথে। প্রথম গন্তব্য ছিল পাটনিটপ হিল স্টেশন। আজ শুধু সেই পাটনিটপ-এর স্মৃতিচারণ।

যত উঠছি বৃষ্টির তীব্রতা তত বেড়ে চলছে। পাহাড়ি পথে বাঁকে বাঁকে রহস্যময়তা সঙ্গে বৃষ্টি, সামনের গাড়ির হঠাৎ ব্রেকডাউন, রাস্তার ধ্বস বিভিন্ন প্রতিকূলতায় আমাদের গাড়ির গতি ক্রমশ কমতে কমতে কখনও একেবারেই স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে।

মনে পড়ছে ঠিক আগের সেপ্টেম্বরে কাশ্মীরের ভয়ঙ্কর বন্যার কথা। অজানা আশঙ্কায় এই প্রথম একটু ভাবনা হচ্ছে। ঘড়ির কাঁটা ছুটছে কিন্তু গাড়ি থমকে। তা বলে প্রকৃতি তো থমকে নেই। সে তার নিজরূপে বিরাজিত, সে তার খামখেয়ালিপনা আর নিজ মর্জিমত চলে আসছে সৃষ্টির সেই আদি মুহূর্ত থেকে।

এবার যে যার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কে কতটা উপভোগ করবে তার অপার সৌন্দর্য বা বন্য বোহেমিয়ানা কিংবা সীমাহীন ঔদ্ধত্য। যেমন এই মুহূর্তে আমি খানিক ম্রিয়মাণ। একটুখানি পাহাড়ি বৃষ্টিতে চুপসে গেল আমার মনের ভেতরে উড়তে থাকা অ্যাভেঞ্চারের ফানুস! মনে হতেই নিজেকে বেশটি করে বকে দিলাম, এতই যদি ভয় তবে ঘটা করে আসার দরকার কী ছিল বাপু? তাই চিন্তা ভাবনা ছেড়ে মন দিলাম চারপাশে।

ইতিমধ্যে উঠে এসেছি হাজারখানেক মিটার। ওই তো মেঘের ভেলা ভেসে বেড়াচ্ছে অনতিদূরে। উড়ে উড়ে ছুটে চলেছে এ পাহাড় থেকে সে পাহাড়। বরফের মুকুটে ধাক্কা দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে পাহাড় চূড়ায়। বিস্তীর্ণ বনরাশি সার দিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের আপাত নিরীহ গাম্ভীর্যে। বৃষ্টিস্নাতা পাহাড়ি পথ কুহকের মত ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে পাইনের হাত ধরে। "এসে গেছি প্রায়। বাইরে কিন্ত বেশ ঠান্ডা। শীতের পোষাক হাতের কাছে রাখুন।" আমাদের ট্যুর নির্দেশক সৌরভের কথায় সম্বিত ফিরল। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের কোলে ঝুলে থাকা আমাদের হোটেল। তখন বোধকরি মনটাও আনচান করছে হোটেলে একটু বিশ্রামের জন্য। ক্লান্তও বটে। ও মা! সেই বাকি পথটুকু পেরোতেও ঘন্টাখানেকের বেশি লাগল। কিন্তু খুব উপভোগ্য সেই পথ।

অবশেষে দুপুরের নির্ধারিত সময় পেছনে ফেলে বিকেল পাঁচটায় হোটেলে ঢুকলাম। চারদিক মেঘের চাদরে ঢাকা। প্রায় অন্ধকার। বাইরে বেরনোর উপায় নেই। বিদ্যুৎ নেই। ঝড়বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পাটনিটপ। কী আর করা যাবে, আপাদমস্তক শীতের পোষাকে ঢেকে জমিয়ে সবে বসেছি, একটু গল্পটল্প করার অছিলায়। হঠাৎই মনে হল বাইরে একটা আলোর আভা দেখা যাচ্ছে। এক লাফে ব্যালকনি। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি পাহাড়ের পেছন দিকে আসতে আসতে আলো ফুটছে।

তারপরই আলোর ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে ধীরে ধীরে ক্রমশ দৃশ্যমান সূর্যদেব। মনে হচ্ছে পাহাড়ের মাথায় কেউ বসিয়ে দিয়ে গেল এক দ্যুতিময় হীরে। কী নয়নাভিরাম সেই দৃশ্য। মেঘের চাদর সরিয়ে বেরিয়ে এল শেষ বিকেলের অস্তগামী সূর্য।

আর আমাদের পায় কে? দুদ্দাড় করে সবাই বেরিয়ে পড়লাম হোটেল থেকে। হোটেলের ঠিক বাইরেই আর্মি কোয়ার্টার ডানদিকে রেখে গিয়ে দাঁড়ালাম এক ভিউ পয়েন্টে। আহা! কী অপরূপ সেই দৃশ্য! পাহাড়ের চূড়ায় মেঘ আর বরফের আলিঙ্গন আর অস্তগামী সূর্যের রঙিন বিচ্ছুরণ।

ফটো তুলতে গিয়ে বেখেয়ালে চলে গিয়েছিলাম একদম কিনারে, এক পা এগোলেই খাদ। এক সেনা অফিসারের হুঁশিয়ারিতে সম্বিত ফিরল। তখনই চোখে পড়ল খাঁজে খাঁজে মোড়ে মোড়ে আমাদের জওয়ানরা। ওই অফিসারের সঙ্গে সন্তোষ আলাপ করল। একজন বাঙালি জওয়ানের সঙ্গে আলাপ হল। কৃষ্ণনগরের ছেলেটির সঙ্গে আড্ডা জমে উঠল। তারপর তার ডাক পড়ল, আর আমরাও বেরিয়ে পড়লাম চড়াই উতরাই পথে। ২০২৪ মিটার (৬৬৪০ ফুট) উচ্চতায় হিমালয়ের শিবালিক পর্বতের হিল স্টেশন, চিনাব নদী বয়ে চলেছে কাছেই - পাটনিটপ মন জয় করে নিল আমাদের। পাটনিটপ অথাৎ 'পাতন দা তালাব' / 'পন্ড অফ দ্য প্রিন্সেস।' নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়াও স্কিইং, ট্রেকিং, প্যারাগ্লাইডিং এর মত অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের জন্যেও ট্যুরিস্টের কাছে আকর্ষণীয়। নাগ টেম্পল, সানাসার, নাথাটপ, শিব মন্দির, মাথাটপ-এর ন্যায় অনেক জায়গা আছে দেখার মতো। হাতে সময় থাকলে ঘোরা যেতেই পারে। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভাল শীতকালে তুষারপাত আর গরমকালে বৃষ্টিতে সময় অসময় যখন তখন হাইওয়ে বন্ধ হয়ে যায় তাই পথে বা হোটেলে বন্দি থাকা ছাড়া গতি নেই। আমাদের ওপর ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন ছিলেন আমরা রোদ, বৃষ্টি, তুষার সব পেলেও বেড়ানোর সময়ের সামান্য পরিবর্তন ছাড়া কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হইনি।

কিছুক্ষণ পরই আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠল। চাঁদের আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত। ঘুরে টুরে হোটেলে ঢোকার আগে দেখা হল একটু আগে আলাপ হওয়া সেই জওয়ান ভাই-এর সঙ্গে, সঙ্গে আরও একজন জওয়ান। সেও বাঙালি, বাড়ি তারকেশ্বর। সত্যি বলতে কী ওই পরিবেশে বাড়ির নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে অতদূরে বসে আমরা সবাই যেন পারিবারিক পুনর্মিলনের আনন্দ উপভোগ করলাম। কী আশ্চর্য! এবার হোটেল ফিরতে হবে। তাপমাত্রা কমতে শুরু করেছে।

সকালে উঠে সূর্যোদয় দেখতে গেলাম। চারদিক কুয়াশাচ্ছন্ন। ধীরে ধীরে কুয়াশা সরে গেল। সোনাঝরা রোদে চারদিক ঝলমল করে উঠল।

আমরা বেঞ্চে বসে চা খাচ্ছি চারদিকে টহল দিচ্ছে ভারতীয় জওয়ানেরা। ওঁরাই বললেন তাড়াতাড়ি বেরতে, কারণ রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। এও বলে দিলেন শ্রীনগর পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে বেরোবেন। আমরা তড়িঘড়ি করে তৈরি হয়ে গাড়িতে উঠলাম। তার আগে দেখা করে এলাম ওই দুই বাঙালি জওয়ানের এর সঙ্গে। ওরাও তৈরি। ডিউটিতে বেরোচ্ছে। হাত নেড়ে গাড়িতে উঠল। ভাল থাকিস ভাই। ভাল থেকো পাটনিটপ। পাটনিটপকে পেছনে ফেলে রেখে এগিয়ে গেলাম শ্রীনগরের পথে।

কলকাতার একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করেন স্বাতী চক্রবর্তী। দৈনন্দিনতায় হাঁপিয়ে উঠলে কোথাও বেরিয়ে পড়েন সুযোগ পেলে। আর তা না হলে মানসভ্রমণ, বিভিন্ন ভ্রমণ ম্যাগাজিন, ট্রাভেল ওয়েবপেজ-এর সঙ্গে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly , please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory .

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-18 - AmaderChhuti.com • W eb Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher